বিবেকানন্দের সাহিত্য

প্রথম খণ্ড

ডক্টর জয়ন্ত গোস্বামী
ডক্টর মায়াঞ্জনা গোস্বামী

—: পরিবেশক :—
পুস্তক বিপণি
২৭ বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক :
কেশব জানা
ঋক প্রকাশনী
১৫৪, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড
কলিকাতা-৭০০০০৬

গ্রন্থস্বত্ব :
ডঃ (শ্রীমতী) মায়াঞ্জনা গোস্বামী

প্রচ্ছদ :
নবীন কুঠারী

মুদ্রণ :
শ্রীঅজিতকুমার সাউ
নিউ রূপলেখা প্রেস
৬০, পটুয়াটোলা লেন
কলিকাতা-৭০০০০৯

প্রথম মুদ্রণ ও প্রকাশ :
'জন্মাষ্টমী' (১৯শে ভাদ্র) ১৩৬৪

পরম প্রীতিভাজন

শ্রীযুক্ত চণ্ডীদাস মাল

এবং

শ্রীমতী নমিতা মালকে

—দাদা-বৌদি

স্বামী বিবেকানন্দের রচনা পরিমাণে নিতান্ত কম না হলেও, বাংলা ভাষায় তাঁর নিজ লেখনীপ্রসূত গ্রন্থ মোট চারখানি। সুতরাং চারটি গ্রন্থকে কেন্দ্র করেই বর্তমান গ্রন্থটি পরিকল্পিত হয়েছে। 'এক-একটি খণ্ড এক-একটি গ্রন্থ-কেন্দ্রিক।

প্রথম খণ্ড : প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

দ্বিতীয় খণ্ড : পরিব্রাজক

তৃতীয় খণ্ড : বর্তমান ভারত

চতুর্থ খণ্ড : ভাববার কথা

পঞ্চম খণ্ড : পত্রাবলী ও কবিতা

বর্তমান গ্রন্থের খণ্ডগুলিতে স্বামী বিবেকানন্দকে তাঁর সাহিত্যিকতার মধ্যে দিয়েই উপলব্ধির চেষ্টা করা হয়েছে।

—বিনীত

জয়ন্ত গোস্বামী

মায়াঞ্জনা গোস্বামী

প্রথম খণ্ড

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

বিষয়-সূচী

এক	গদ্যরীতির বিবর্তন	১
দুই	বিবেকানন্দের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য	৭
তিন	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—গদ্যরীতি	১২
চার	প্রবন্ধধারার বিবর্তন	১৭
পাঁচ	বিবেকানন্দের প্রবন্ধরীতির বৈশিষ্ট্য	২৩
ছয়	প্রবন্ধ স্বরূপ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	২৭
সাত	ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা	৩৩
আট	সমকালীন চিন্তার পটভূমিকায় বিবেক চিন্তা	৪৬
নয়	চিন্তাধারা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য	৫১
দশ	বিবেকানন্দের জীবন	৫৭
এগার	বিবেকানন্দের সাহিত্য	৭২
বারো	বিবেক মানস	৮৩
তেরো	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রসঙ্গসূচী	৮৮
চৌদ্দ	বিষয় নির্যাস	৮৯
পনের	প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য গ্রন্থের প্রসঙ্গগত তথ্য-নির্দেশ	১২০

১

গদ্য-রীতির বিবর্তন

বাংলা গদ্য রীতি সম্পর্কে চেতনা জনমানসে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে অনুপস্থিত ছিলো, যদিও প্রাগাধুনিক যুগেও যথারীতি বাংলা গদ্যের অস্তিত্ব ছিলো। সাহিত্যে বাংলা গদ্যের প্রবর্তনা উনবিংশ শতাব্দীতে ঘটে এবং এর কারণ ছিলো। প্রাগ্ উনবিংশ শতাব্দীতে গ্রন্থ প্রচারের মাধ্যম ছিলো গানের আসর। সুরারোপের মাধ্যমে গায়েন গ্রন্থের বিষয়বস্তু আসরে পরিবেশন করতেন। প্রত্যেক গ্রন্থকর্তাই নিজ নিজ গ্রন্থ প্রচারের ইচ্ছা মনে পোষণ করতেন। গদ্যে গ্রন্থ রচনা করলে সুরারোপ সম্ভব হতো না এবং আসরে প্রচার করাও সম্ভব ছিলো না। পদ্যে সুরারোপ সহজসাধ্য, তাই সে যুগে সকলেই পদ্যে গ্রন্থ রচনা করতেন। সেই কারণে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সাহিত্যে বাংলা গদ্য অনুপস্থিত ছিলো।

তবে গদ্যের অস্তিত্ব ছিলো চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ ইত্যাদিতে। কারণ এগুলি জনসমক্ষে প্রচারের বাসনা লেখকের ছিলো না। প্রাগাধুনিক যুগে তাই এই জাতীয় গদ্য রচনার সাক্ষাৎকার লাভ করি। গ্রন্থ প্রচারের বৈকল্পিক পন্থা অর্থাৎ মুদ্রণের মাধ্যমে গ্রন্থের সংখ্যাধিক্য সৃষ্টি করে পাঠকদের মধ্যে তা বণ্টন করবার রীতি মুদ্রাযন্ত্র প্রতিষ্ঠার পরেই প্রবর্তিত হয়। এদেশে বাংলা টাইপ সম্বলিত মুদ্রাযন্ত্রের

প্রতিষ্ঠা ঘটে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে। কিন্তু এই বৈকল্পিক পন্থাটি কার্যকরী হয় অপর একটি প্রয়োজন থেকে।

এদেশে অবস্থানকারী বিদেশী শাসক গোষ্ঠী আঞ্চলিক ভাষায় অনভিজ্ঞ ছিলো। শাসনকার্যের সুবিধার জন্যে তারা বাংলা ভাষা শেখবার প্রয়োজন উপলব্ধি করলো। গ্রন্থ পাঠে ভাষা শিক্ষা সহজ হয়। কিন্তু পদ্য গ্রন্থেরই শুধুমাত্র অস্তিত্ব থাকায় গদ্য গ্রন্থের প্রয়োজন তারা উপলব্ধি করে। ইতিমধ্যে পূর্বোক্ত বৈকল্পিক পন্থাটি প্রবর্তিত হওয়ায় শাসক শ্রেণীর তাগিদে এ দেশীয় ব্যক্তিদের অনেকে গদ্যে লেখনী চালনা করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের গদ্য লেখক গোষ্ঠীর বাংলা গদ্য সমূহ এই ভাবেই রচিত হয়।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজীয় গদ্য গ্রন্থগুলি থেকে চারটি রীতির দর্শন মেলে। (১) কেরী সাহেবের 'কথোপকথন' গ্রন্থে বিধৃত চলিত গদ্যের রীতি (২) ইংরিজী ব্যাকরণ অনুসারী সাহেবী গদ্য বা বাইবেলী গদ্য (৩) রাম রাম বসুর ফার্সী-শব্দ-বহুল গদ্য (৪) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের সংস্কৃত-শব্দ-বহুল গদ্য।

প্রকৃত গদ্যের মধ্যে থাকবে চিন্তা ও অনুভূতির ভারবহণ ক্ষমতা এবং গতিশক্তির সমন্বয়। উল্লিখিত প্রথম জাতীয় গদ্যরীতির মধ্যে গতিশক্তি থাকলেও গতিশক্তির আত্যন্তিকতায় ভারবহণ ক্ষমতা ছিলো না। কলেজীয় শিক্ষার জন্যেও যেমন, সাহিত্যসৃষ্টির জন্যেও তেমন এ জাতীয় গদ্যের ঠিক উপযোগিতা ছিলো না। পরবর্তীকালে চিন্তা-মূলক সাহিত্যের ব্যাপক চর্চার মধ্যে এই ধারা বিলুপ্ত হয়।

বাইবেলী গদ্য ইংরিজী ব্যাকরণের অনুগত ছিলো বলে আমাদের দেশের সম্পূর্ণ অনুপযোগী ছিলো এবং তা আমাদের কাছে অত্যন্ত কৃত্রিম বলে মনে হতো। পরবর্তীকালে এই ধারা বাইবেলের মধ্যে আত্মগোপন করে। বিশেষতঃ দেশীয় ব্যক্তিদের ব্যাপকভাবে গদ্য রচনায় এদেশে এ জাতীয় গদ্যের মূল্য সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যায়।

ফার্সী গন্তের সঙ্গে রাম রাম বাবুর নাম সংযুক্ত করা হলেও সর্বত্র তিনি ফার্সী-শব্দ-বহুল গন্ত লেখেন নি। তবু ফোর্ট উইলিয়ম কলেজীয় যুগে ফার্সী-শব্দ-বহুল গন্তরীতির আদর্শ তাঁর গন্তেই প্রথম আভাসিত হয়। এই গন্তও কালক্রমে বিলুপ্ত হয়। কারণ ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে আদালতে ফার্সী ভাষা প্রচলন বন্ধ হওয়ায় জনজীবনে ফার্সী শব্দের প্রভাব অনেকটা কমে যায়। দ্বিতীয়তঃ গন্তের প্রবর্তনের ক্ষেত্রে মুসলমান সমাজ প্রারম্ভে কিছু অসহযোগিতা দেখান। তৃতীয়তঃ প্রতিস্পর্ধী সংস্কৃত-শব্দ-বহুল গন্তের প্রতিষ্ঠা ফার্সী-শব্দ-বহুল গন্তরীতি অপ্রতিষ্ঠিত অবস্থায় ইসলামী ধর্মগ্রন্থের মধ্যে কালক্রমে আত্মগোপন করে।

মৃত্যুঞ্জয় প্রবর্তিত সংস্কৃত-শব্দ-বহুল গন্তরীতিই প্রতিষ্ঠা লাভ করে। কারণ, প্রথমতঃ সংস্কৃত শব্দ সমূহের ঐশ্বর্য ভারবহণ ক্ষমতার উপযোগী ছিলো। দ্বিতীয়তঃ এই ধারার প্রবর্তয়িতা মৃত্যুঞ্জয় প্রতিভাবান্ ছিলেন। তৃতীয়তঃ এই লেখকগোষ্ঠীর প্রধান কেরী সাহেব স্বয়ং এই ধারার পৃষ্ঠ-পোষকতা করেন। চতুর্থতঃ অব্যবহিত পরবর্তী রাম-মোহনের হিন্দুধর্ম সম্পর্কিত আলোচনায় অপরিহার্য তৎসম শব্দের বাহুল্য মৃত্যুঞ্জয়ী গন্তের support রূপে বিন্তমান্ ছিলো। সুতরাং দেখা যায়, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজীয় যুগে মৃত্যুঞ্জয়ের সংস্কৃত-শব্দ-বহুল গন্তরীতিই ছিলো প্রতিষ্ঠিত গন্তরীতি।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজীয় যুগের পর আসে রামমোহনের যুগ। রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছেন, রামমোহন বাংলা গন্তকে গ্রানাইট শিলার ওপরে স্থাপন করেছেন। বাস্তবিকই বাংলা গন্তে তিনিই প্রথম দৃঢ়তা এনেছেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজীয় গ্রন্থগুলি ছিলো শিক্ষামূলক গ্রন্থ এবং এগুলির উদ্দেশ্য ছিলো ভাষা শিক্ষা দান। তাই এগুলির মধ্যে শব্দের দুরূহতা এবং পরিমাণবৃদ্ধি তথা বৈচিত্র্যবৃদ্ধি—এক কথায় বহিরঙ্গের দিকে অতিরিক্ত দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে। ফলে এগুলি দৃঢ়তা

হারিয়েছে। রামমোহন তর্ক-বিতর্কের মধ্যে বাংলা গদ্যকে প্রবিষ্ট করিয়ে গদ্যকে করলেন শাণিত ও ব্যবহারিক। এই সময়েই সাময়িক পত্রের প্রবর্তন ঘটে। বাস্তব বিষয় সম্বলিত এই সাময়িক পত্রগুলির মাধ্যমে বাংলা গদ্য অর্জন করলো বাস্তবতা। সুতরাং রামমোহন যুগে বাংলা গদ্যের মধ্যে ধর্ম চর্চার চাপে তৎসম শব্দের আধিক্য থাকলেও এ যুগে বাংলা গদ্যের মধ্যে অনেক ত্রুটি লুপ্ত হয়েছে।

রামমোহন বাংলা গদ্যে চিন্তার একাংশের ভারবহণ ক্ষমতা দিয়েছেন। চিন্তা দুই প্রকার—পার্থিব এবং পারমার্থিক। ধর্মালোচনার মাধ্যমে রামমোহন পারমার্থিক চিন্তার ভারবহণের ক্ষমতা এনে দিলেন।

তারপর বাংলা গদ্যের ইতিহাসে অবতীর্ণ হলেন অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ সমূহ রচনার মাধ্যমে অক্ষয়কুমার এবং সমাজ বিষয়ক কয়েকটি প্রস্তাব গ্রন্থ রচনা করে বিদ্যাসাগর মহাশয় প্রকারান্তরে পার্থিব চিন্তার ভারবহণের ক্ষমতা বাংলা গদ্যকে প্রদান করলেন। সুতরাং দেখা গেলো, এই যুগে বাংলা গদ্য চিন্তার ভারবহণে সম্পূর্ণ ক্ষমতা অর্জন করেছে।

অনুভূতির অভিব্যক্তি অত্যন্ত সূক্ষ্ম বিষয়, চিন্তার অভিব্যক্তি অপেক্ষাকৃত স্থূল। স্থূলতার মাধ্যমেই সূক্ষ্মতার পথে পদক্ষেপ করতে হয়। সুতরাং অনুভূতির ভারবহণ ক্ষমতা লাভের পূর্বে চিন্তার ভারবহণ ক্ষমতা অর্জন করতে হয়। সাহিত্য দুই প্রকার—ভাবের সাহিত্য ও জ্ঞানের সাহিত্য। সুতরাং উভয় প্রকার ভারবহণ ক্ষমতা লাভেরই প্রয়োজন বাংলা গদ্যের আছে। চিন্তার ভারবহণ ক্ষমতা লাভ করে এই যুগেই বাংলা গদ্য অনুভূতির ভারবহণ ক্ষমতা অর্জনে পদক্ষেপ করে।

অন্তরের ভাবসমূহ তরঙ্গ আকারে আত্মপ্রকাশ করে। এই ভাবতরঙ্গকে রূপ দিতে গেলে গদ্যকেও করা উচিত তরঙ্গায়িত।

পূর্বে যখন সাহিত্যে গদ্য ছিলো না, তখন বিভিন্ন প্রকার ছেদ চিহ্নের প্রয়োজন ছিলো না। (।) এবং (॥)-এর মাধ্যমেই সব প্রয়োজন মিটে যেতো। পরবর্তীকালে গদ্যের প্রবর্তন ঘটলেও ছেদ চিহ্নের বৈচিত্র্য আসে নি, বরং (॥)-চিহ্নের লোপ ঘটেছে। ফলে গদ্যে তরঙ্গ সৃষ্টির কোনো উপায় ছিলো না, কিংবা তরঙ্গ থাকলেও তাকে চিহ্নিত করবার উপায় ছিলো না। বিদ্যাসাগর মহাশয় ইংরিজী গদ্যের অনুকরণে বাংলা গদ্যে ইংরিজী যতি-চিহ্ন সমূহ প্রয়োগ করলেন। কমা, সেমিকোলন, ড্যাস—ইত্যাদি বিভিন্ন চিহ্নের প্রয়োগের ফলে গদ্যের তরঙ্গ উপলব্ধি করা পাঠকের পক্ষে সহজ সাধ্য হলো। গদ্যের মধ্যে তিনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম ভারের তরঙ্গ সৃষ্টি করবার জন্যে উপযুক্তভাবে শব্দ নির্বাচন ও বিন্যাস করলেন। তৃতীয়তঃ বুদ্ধির নিয়ন্ত্রণে শব্দ নির্বাচন না করে অনুভূতির নিয়ন্ত্রণে শব্দ নির্বাচন করলেন। সুতরাং বিদ্যাসাগর পর্যন্ত বাংলা গদ্য চিন্তা ও অনুভূতির ভারবহণে সম্পূর্ণভাবে সমর্থ হলো।

কিন্তু শুধুমাত্র ভারবহণেই গদ্যের সার্থকতা আসে না। গদ্যকে হতে হবে গতিশক্তি সম্পন্ন। গদ্য সম্পর্কে এই চেতনা গদ্য লেখকগণ ক্রমেই বিস্মৃত হয়ে পড়েছিলেন। তাই এই যুগে গদ্যের গতিশক্তি বৃদ্ধির জন্যে নতুন আন্দোলন আসে টেকচাঁদ ঠাকুর (প্যারীচাঁদ মিত্র) এবং হুতোমের (কালীপ্রসন্ন সিংহ) লঘু জাতীয় রচনার মাধ্যমে। এই সময়েই কিছু কিছু বাস্তবধর্মী নাট্য রচনা গদ্যের গতি সম্পর্কে চেতনা দানে সহায়তা করে। এর পরেই বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র।

প্রাগ্‌বঙ্কিম বাংলা গদ্যে প্রকৃত গদ্যাদর্শের সর্ব প্রকার উপাদান বিভিন্ন গদ্য লেখকদের রচনার মধ্যে দিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে প্রকাশ পেলেও সেগুলি এ পর্যন্ত কোনো গদ্য লেখকের গদ্যে একত্র উপস্থিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ উন্নত গদ্যাদর্শ সৃষ্টি করে নি। বঙ্কিমচন্দ্রের গদ্যেই প্রথম অনুভূতি ও চিন্তার ভারবহণ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে গতিশক্তির ভারসাম্য রক্ষিত

হয়েছে। তার সঙ্গে গদ্যরীতিতে বঙ্কিমের নিজস্ব সংযোগ—লয়-বৈচিত্র্য সৃষ্টি। এতোদিন গদ্য রচনাগুলি যে লয়ে আরম্ভ, সেই লয়েই শেষ হতো। কিন্তু পরিবর্তনশীল মন চিন্তার ক্ষেত্রে কিংবা অনুভূতির ক্ষেত্রে কখনো বা দ্রুত পদক্ষেপ করে, কখনো বা পদক্ষেপ করে মন্থর গতিতে। তদনুযায়ী একই গদ্যরচনায় শব্দ বিন্যাসের বিশিষ্টতার মাধ্যমে চিন্তা ও অনুভূতির লঘুগুরু তারতম্য অনুযায়ী লয়-বৈচিত্র্য এসে দেখা দিয়েছে। ভারবহণ ক্ষমতার সঙ্গে গতিশক্তির সংযোগে এবং চিন্তা বা অনুভূতির গুণ বা মাত্রা অনুযায়ী সেই গতিশক্তির সঙ্গে ভার-এর বিশিষ্ট বিশিষ্ট সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে বঙ্কিম বাংলা গদ্যরীতিকে পরিপূর্ণতা দান করলেন।

বাংলা গদ্যে বঙ্কিমের আবির্ভাব ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে এবং তার বছর দুয়েক পূর্বে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে স্বামী বিবেকানন্দ জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং পূর্ণাঙ্গ গদ্যাদর্শ তিনি দ্বন্দ্বহীন ও সর্বজন স্বীকৃতভাবেই সন্দর্শন করেছেন। বিবেকানন্দের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য সেই পূর্ণাঙ্গ গদ্যকেই প্রাথমিকভাবে আশ্রয় করেছে বটে, তবে তার স্বতন্ত্র একটি সত্তাও অনেকে উপলব্ধি করে থাকেন। অবশ্য বঙ্কিমোত্তর যুগের অন্যান্য গদ্যলেখকের গদ্যের মতো তাঁর গদ্য একটি বিশেষ style-এর পরিচয়বাহী।

২

বিবেকানন্দের গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য

যে যুগে বঙ্কিমী গদ্যরীতির অপ্রতিহত প্রভাব এবং প্রতিভাবান্ লেখক রবীন্দ্রনাথও যে যুগে বঙ্কিমী গদ্যরীতিতে রচনাভ্যাস করছিলেন, বিবেকানন্দের রচনা সে যুগের। অথচ দেখা যায়, এই যুগেই বিবেকানন্দ তাঁর নিজস্ব রীতির পরিচয় রেখে যেতে সমর্থ হয়েছেন। বঙ্কিমের রক্ষণশীলতা ঐতিহ্যমুখী রচনাগুলির গদ্যরীতিকে সমাসাকীর্ণ তৎসম শব্দ কণ্টকিত ও মন্থর করেছে। ঐতিহ্যমুখীনতা শেষের দিকে প্রাধান্য বিস্তার করায় এই মন্থরতাকে গদ্যের ত্রুটি স্বরূপ গণ্য করে পরবর্তী কালে আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছে। প্রমথ চৌধুরীর চলিত ভাষার আন্দোলনের মূলেও অনেকটা এই কারণ বিদ্যমান্ ছিলো। বঙ্কিম বর্ণনাত্মক বিষয়ের ক্ষেত্রেও তাঁর গদ্যরীতিকে মন্থর করেছেন। এই ত্রুটি বিবেকানন্দেও ছিলো, সন্দেহ নেই। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,—

"ত্রিংশ কোটি মানবপ্রায় জীব—বহু শতাব্দী যাবৎ স্বজাতি বিজাতি স্বধর্মী বিধর্মীর পদভরে নিষ্পীড়িত প্রাণ, দাসসুলভ-পরিশ্রম সহিষ্ণু, দাসবৎ উদ্যমহীন, আশাহীন, অতীতহীন, ভবিষ্যদ্‌বিহীন, 'যেন তেন প্রকারেণ' বর্তমান প্রাণধারণমাত্র-প্রত্যাশী দাসোচিত ঈর্ষা পরায়ণ, স্বজনোন্নতি-অসহিষ্ণু, হতাশবৎ শ্রদ্ধাহীন, বিশ্বাসহীন, শৃগালবৎ নীচ-চাতুরী-প্রতারণা সহায়, স্বার্থপরতার আধার, বলবানের পদলেহক, অপেক্ষাকৃত দুর্বলের যমস্বরূপ, বলহীন, আশাহীনের সমুচিত কদর্য বিভীষণ-কুসংস্কারপূর্ণ, নৈতিক মেরুদণ্ডহীন, পূতিগন্ধপূর্ণ মাংস খণ্ড

ব্যাপী কীটকুলের ন্যায় ভারত শরীরে পরিব্যাপ্ত—ইংরেজ রাজপুরুষের চক্ষে আমাদের ছবি।" (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

বঙ্কিমচন্দ্র গদ্যরীতির আপেক্ষিকতায় বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু এই আপেক্ষিকতার রহস্য হৃদয়ঙ্গম করতে না পেরে বঙ্কিমযুগের অনেক গদ্যলেখকই বঙ্কিমের সৃষ্ট তৎসম-শব্দ বহুল ও সমাস-বহুল গদ্যকেই বঙ্কিমচন্দ্রের আদর্শ গদ্যরীতি বলে ভুল করেছেন। 'বঙ্কিমীগদ্য' নামে যে গদ্যরীতির পরিচয় আমাদের জানা আছে, তাকে বঙ্কিম-প্রদত্ত আদর্শ বলে গণ্য করলে বঙ্কিম-প্রবর্তিত লয়-বৈচিত্র্যের মূল্য একেবারেই থাকে না। অথচ বাংলা গদ্যে বঙ্কিমচন্দ্রের প্রকৃত অবদান সেখানেই। এই আপেক্ষিকতার মূল্য হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন বঙ্কিমযুগে একমাত্র বিবেকানন্দ।

অথচ বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে তাঁর প্রধান পার্থক্য গদ্যে চলিত ভাষায় প্রয়োগের ক্ষেত্রে। বিরাট অধ্যাত্মচেতনার অধিকারী বিবেকানন্দ চলিতভাষাকেই গদ্যরীতিতে গ্রহণ করেছেন। শুধু সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে চলিতভাষার বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেই ক্ষান্ত হন নি, অনেক ক্ষেত্রে বিস্ময়কর ভাবে মুখের ভাষাকে গদ্যে রূপ দিয়েছেন। বঙ্কিমযুগে তিনি 'সবুজপত্র' যুগের আগমনী গেয়েছেন ঠিকই, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গেও তাঁর পার্থক্য আছে। অন্যদিকে প্রাগ্‌-বিবেক বাংলা সাহিত্যের চলিত ভাষার সঙ্গেও বিবেকানন্দের সৃষ্ট চলিত ভাষার ব্যবধান যথেষ্ট। তাঁর চলিত রীতি একেবারে কলকাতার খাঁটি "ককনি" অথচ অশিষ্ট বা অমার্জিত নয়। তাঁর রীতিতে হুতোমী দুঃসাহসিকতা আছে, কিন্তু রুচি-দুষ্টি নেই। প্রমথ চৌধুরীর মননশীলতা বিবেকানন্দের গদ্যেও আছে, কিন্তু প্রমথ চৌধুরীর অতিরিক্ত বহিরঙ্গ-চেতনা বা ভাষায় মারপ্যাঁচ সেখানে অনুপস্থিত।

বিবেকানন্দের মেজাজের বৈচিত্র্য ভাষার মেজাজেও বৈচিত্র্য এনেছে। কখনো তা গুরু গম্ভীর, ওজস্বী, কখনো বা লঘু চপল এবং

দ্রুত গতিশীল। তিনি যে সমাস ও বিশেষণ কণ্টকিত গদ্যরীতিতে সুদক্ষ ছিলেন, তার পরিচয় দেওয়া হয়েছে, সহজ তীক্ষ্ণ গদ্যও তাঁর আছে। দৃষ্টান্ত দিই,—

"ঐ যে হিমালয় পাহাড় দেখ্‌ছ, ওরই উত্তরে কৈলাস, সেথা বুড়ো শিবের প্রধান আড্ডা। ও কৈলাস দশমুণ্ড-কুড়ির হাত রাবণ নাড়াতে পারেন নি, ও কি এখন পাদ্রী ফাদ্রীর কর্ম !! ঐ বুড়ো শিব ডমরু বাজাবেন, মা কালী পাঁঠা খাবেন, আর কৃষ্ণ বাঁশী বাজাবেন,—এ দেশে চিরকাল। যদি না পছন্দ হয়, সরে পড় না কেন? তোমাদের দু-চারজনের জন্য দেশসুদ্ধ লোককে হাড়-জ্বালাতন হতে হবে বুঝি? চরে খাও গে না কেন?—এতবড় দুনিয়াটা পড়ে তো রয়েছে। তা নয়। মুরদ কোথায়? ঐ বুড়ো শিবের অন্ন খাবেন, আর নিমক হারামি করবেন, যীশুর জয় গাইবেন—আ মরি !!"

(প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য)

দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিও একই প্রবন্ধ থেকে দেওয়া হলো—লয়-বৈচিত্র্য বোঝাবার জন্যে। এই চলিত গদ্য তাঁর চিঠিপত্রে আরোপ সহজ, আরও স্বতঃস্ফূর্ত অথচ শক্তিশালী। বিবেকানন্দের চলিত গদ্য সম্পর্কে ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত মন্তব্য করেছেন,—"কথা বলা এবং লেখার বিরোধটাকে স্বামিজী অনেক স্থানে আশ্চর্য রকম মিটাইয়া লইয়াছেন, কথ্য ভাষা এবং কথ্যরীতির উপরে তাঁহার একটা বিশেষ দখল ছিল; অনুরক্ত গোষ্ঠীর ভিতরে তিনি যেমন করিয়া অনুপ্রাণিত ভাবে অনর্গল কথা বলিয়া যাইতেন,—তেমন করিয়াই তিনি অনায়াসে লিখিয়া যাইতে পারিতেন।"

বিবেকানন্দ সাহিত্যকর্মে সর্বদাই চলিত গদ্যরীতি প্রয়োগের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর অধিকাংশ গদ্যই চলিত রীতির অনুসারী। চলিত ভাষার প্রকৃষ্ট রূপ ও শিল্প নৈপুণ্য সম্পর্কে তিনি তাঁর একটি পত্রে লিখেছেন,—

"চলিত ভাষায় কি আর শিল্প-নৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা তৈয়ার করে কি হবে?...স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই—তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সেদিকে ফেরে, তেমন কোন তৈয়ারী ভাষা কোনও কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেন সাফ্ ইস্পাৎ, মুচ্ড়ে মুচ্ড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়,—দাঁত পড়ে না।"

('বাঙ্গালাভাষা'—ভাববার কথা)

বিবেকানন্দ চলিত ভাষার এই শক্তিকে শুধুমাত্র থিয়োরী হিসেবে বিশ্বাস করেন নি, লেখনীতেও তাকে প্রয়োগ করেছেন। পূর্বে প্রদর্শিত দৃষ্টান্তটিতে তার প্রমাণ। একটি দৃষ্টান্তে মুখের ভাষাকে যথাযথ ভাবেই খুঁজে পাওয়া যাবে।—

"বলি রঙের নেশা ধরেছে কখন কি?—যে রঙের নেশায় পতঙ্গ আগুনে পুড়ে মরে, মৌমাছি ফুলের গারদে অনাহারে মরে? হুঁ বলি—এই বেলা গঙ্গা মা'র শোভা যা দেখ্‌বার দেখে নাও; আর বড় একটা কিছু থাক্‌চে না! দৈত্য দানবের হাতে পড়ে এসব যাবে! ঐ ঘাসের জায়গায় উঠবেন—ইটের পাঁজা, আর নাব্‌বেন ইটখোলার গর্তকুল।"

বিবেকানন্দের সাধুভাষা প্রয়োগের ক্ষেত্রেও একই গতিশক্তি বিদ্যমান্। তাঁর অনেক রচনায় যেমন মেজাজী মনোভঙ্গী আছে, তেমনি কিছু রচনা আছে যেখানে তিনি আবেগের মধ্যে নিজেকে হারিয়ে ফেলেছেন,—"সদর্পে ডাকিয়া বল—ভারতবাসী আমার ভাই, ভারতবাসী আমার প্রাণ, ভারতের দেবদেবী আমার ঈশ্বর, ভারতের সমাজ আমার শিশু শয্যা, আমার যৌবনের উপবন, আমার বার্ধক্যের

বারাণসী ; বল ভাই—ভারতের মৃত্তিকা আমার স্বর্গ, ভারতের কল্যাণ আমার কল্যাণ ; আর বল দিন-রাত, 'হে গৌরীনাথ. হে জগদম্বে, আমায় মনুষ্যত্ব দাও ; মা, আমার দুর্বলতা কাপুরুষতা দূর কর, আমায় মানুষ কর।"

সাধু এবং চলিত উভয় গদ্যরীতিতেই বিবেকানন্দের একটি বৈশিষ্ট্যই দেখা যাবে, তা হচ্ছে গতিমুখরতা। বস্তুতঃ যে প্রাণশক্তি বিবেকানন্দের জীবনকে কর্মমুখর ও গতিশীল করেছে, সেই একই প্রাণশক্তি তাঁর গদ্যরীতিকে করেছে গতিমুখর। এই গতিশীলতার চাপে তিনি চলিত গদ্যরীতিকেই বেশি মূল্য দিয়েছেন। সর্বশেষে উল্লেখ করা চলে যে, যার প্রেরণা তাঁর জীবনকে করেছে গতিশীল সেই ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকাশভঙ্গীর প্রভাবও তাঁর গদ্যে আবিষ্কার করা কঠিন নয়।

৩

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য—গদ্যরীতি

বিবেকানন্দের রচনাবলীর সংখ্যা অপ্রচুর না হলেও তাঁর রচিত বাংলা গ্রন্থ চারটি। (১) ভাববার কথা (২) পরিব্রাজক (৩) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য এবং (৪) বর্তমান ভারত। প্রথম তিনটি চলিত ভাষায় এবং শেষেরটি সাধু ভাষায় লেখা। তাঁর পত্রাবলী অবশ্য প্রয়োজনানুযায়ী সাধু ও চলিত—দুই রীতিতেই লেখা। বিবেকানন্দের সাধুভাষায় যেমন স্বাতন্ত্র্য রক্ষিত হয়েছে, চলিত রীতির ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য। বরং চলিত গদ্যে বিবেকানন্দের বাণীভঙ্গী (Style) বিস্ময়কর।

সাহিত্যে চলিত গদ্যরীতির প্রবেশ ঘটে কেরী সাহেবের কথোপকথন গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে। তারপর ধর্মীয় তর্কবিতর্কের যুগে ধর্মীয় পরিভাষার চাপে বাংলা গদ্য তৎসম শব্দ কণ্টকিত হয়ে এই রীতিকে সম্পূর্ণ বিস্মৃত হয়েছে। বহুদিন পরে ঈশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত 'সংবাদ সাধুরঞ্জনে' (১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৫৬ সাল) "স্ত্রীবিদ্যা-বিষয়ে দুইজন স্ত্রীলোকের কথোপকথন" নামে প্রশ্নোত্তর মূলক রচনার মধ্যে চলিত গদ্যের প্রয়োগ দেখা গেলো। তারপরে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রামনারায়ণ তর্করত্নের 'কুলীন কুলসর্বস্ব' নাটকের পর থেকে নাটকে চলিত গদ্যরীতির অনুবর্তন চলতে লাগ্‌লো। নাটক ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রে চলিত রীতির প্রয়োগে 'আলালের ঘরের দুলাল' এবং 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'—গ্রন্থ দুটির আন্দোলনাত্মক প্রকাশ ইঙ্গিতপূর্ণ।

নাটকে ব্যাপক আকারে চলিত রীতির অনুসরণ সাহিত্যে চলিত রীতিকে অনেকটা প্রতিষ্ঠা করলেও উপন্যাসে চলিত রীতি প্রয়োগে কিছু দ্বন্দ্ব লক্ষিত হয়। বলাবাহুল্য প্রবন্ধে চলিত রীতি অনুসরণের সাহস আরও পরবর্তীকালে ঘটেছে। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথও প্রথম-যুগে চলিত রীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশয়ী ছিলেন। ১২৮৬—৮৭ সালে তাঁর 'য়ুরোপ প্রবাসীর পত্র' 'ভারতী'তে প্রকাশিত হয় সাবলীল চলিত গদ্য রীতিতে। কিন্তু ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে 'সবুজ পত্র' প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত চলিত রীতি প্রয়োগে তাঁর আত্মপ্রত্যয়ের অভাব ছিলো।

যে যুগে চলিত গদ্যরীতি সম্পর্কে গদ্যলেখকগণ ছিলেন সংশয়া, সে যুগে আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে মুখের ভাষাকে গদ্যে রূপ দিয়ে বিবেকানন্দ বাংলা গদ্যরীতির ক্ষেত্রে অগ্রগতি এনেছিলেন। "ভাববার কথা" গ্রন্থে লিখেছেন,—স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না।" চলিত গদ্যরীতির ক্ষেত্রে তখনও Standard Colloquial ভাষার প্রতিষ্ঠা ঘটে নি, তাই কলকাতার আঞ্চলিক ভাষার পক্ষে তাঁর রায় ছিল। তিনি বলেছেন,—"প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান্ হচ্চে এবং ছড়িয়ে পড়েছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ এক কলকেতার ভাষা।"

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' এই চলিত রীতিতেই লেখা। তাঁর এই চলিত রীতি গ্রহণের মূলে কয়েকটি কারণ ইঙ্গিত করা চলে। (ক) অন্তরের প্রচণ্ড গতিসম্পন্নতা (খ) বাগ্মীমনের প্রাধান্য (গ) রামকৃষ্ণের প্রকাশ ভঙ্গীর প্রভাব (ঘ) বক্তব্যকে ব্যাপকভাবে শিক্ষিত অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকলের কাছে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্য।

যে বিবেকানন্দ ব্রাহ্মণ ভারতবাসী ও চণ্ডাল ভারতবাসীকে রক্ত ও ভাইয়ের মতো উপলব্ধি করেছেন, তিনি শব্দের ক্ষেত্রেও কোনো

শুচিবায়ুকে গুরুত্ব দেন নি। 'ভাববার কথা' গ্রন্থে তবু দু-একটি ক্ষেত্রে সাধু ক্রিয়াপদের ব্যবহার ঘটেছে। কিন্তু 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' সব দিক থেকেই বিবেকানন্দের গদ্য স্টাইলের সবচেয়ে সার্থক পরিচয়। স্বামিজী তাঁর বক্তব্যকে সুন্দরভাবে ও স্পষ্টভাবে প্রকাশ করবার জন্যে সমাসবদ্ধ পদ, তৎসম শব্দ, তদ্ভব, অর্ধতৎসম ও দেশীবিদেশী শব্দ অবলীলাক্রমে ব্যবহার করেছেন। এমন কি গ্রাম্য ও মেয়েলী শব্দ ও পদবিন্যাসও প্রয়োগ করতে সঙ্কোচবোধ করেন নি। বক্তব্য ও প্রকাশভঙ্গীর এমন সাযুজ্য সাধারণতঃ অন্যান্য গ্রন্থে দেখা যায় না। শব্দগ্রহণে তাঁর নির্বিচার দৃষ্টিভঙ্গীর বিষয়ে আরও কয়েকজনের প্রসঙ্গ মনে আসে। হুতোমী ভাষাতেও এই দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেও তাতে কুরুচির প্রভাব আছে। বীরবলী গদ্যেও এই দৃষ্টিভঙ্গী বিদ্যমান, তবে শব্দ নিয়ে পালোয়ানী মনোবৃত্তি বা অতিরিক্ত শব্দ-চেতনা যে নিকর্ষ সূচনা করে, বিবেকানন্দের গদ্যে তা নেই। বিবেকানন্দ চলিত রীতির সঙ্গে পরবর্তীকালের সমাজবিদ্ বিনয় সরকারের গদ্যরীতির কিছুটা তুলনা চলে। উভয়েরই প্রাণশক্তির প্রাচুর্য চলিত গদ্যরীতিটিকে করেছে প্রচণ্ড শক্তিশালী। তবে বিবেকানন্দ শব্দ প্রয়োগের ক্ষেত্রে কিছুটা অনুভূতির নিয়ন্ত্রণ মেনে চলেছেন, এবং তাই তাঁর ভাষায় শ্রুতিকটুতা আসে নি।

ভাষা সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব আদর্শই তিনি 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে অনুসরণ করেছেন। তিনি বলেছেন—"ভাষা খুব সরল হওয়া চাই। আমি আমার গুরুর ভাষাকে অনুসরণ করি। উহা যেমন চলিত ভাষা তেমনি ভাবের প্রকাশক। ভাষা এমন হওয়া চাই যাহাতে ভাব অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে।" (স্বামী বিবেকানন্দ ও বাংলার উনবিংশ শতাব্দী : গিরিজাশঙ্কর রায় চৌধুরী)।

আজকাল অনেকে ভারবহণ ক্ষমতা চলিত ভাষায় বৃদ্ধি করবার জন্যে শুধুমাত্র সর্বনাম ও ক্রিয়াপদে চলিত রীতির বৈশিষ্ট্য মেনে

চলেন। ফলে সাধুভাষার মতো তাতেও গতিশক্তি ব্যাহত হয়। বিবেকানন্দ সর্বনাম ও ক্রিয়াপদের লঘুত্ব সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত বাক্‌রীতি, বিশিষ্টার্থক বাক্যাংশ, ঘরোয়া ও মেয়েলি বাগ্‌ভঙ্গী পর্যন্ত ব্যবহার করে চলিত ভাষার সর্বাঙ্গীণ বৈশিষ্ট্য রক্ষা করেছেন।

ঐতিহ্যবিবৃতি এবং বর্ণনাত্মক বিষয়ে বিবেকানন্দ প্রচলিত রীতির প্রভাবে তৎসম শব্দ ও সমাসবদ্ধ পদ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তা তাঁর সাময়িক অবস্থান্তর মাত্র। আবার তিনি সহজ রীতিতে ফিরে এসেছেন। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থে একস্থানে লিখেছেন,—"অট্টালিকাবক্ষে জীর্ণ কুটীর, দেবালয় ক্রোড়ে আবর্জনাস্তূপ, পট্টশটাবৃতের পার্শ্বচর কৌপীনধারী, বহ্বন্নতৃপ্তের চতুর্দিকে ক্ষুৎকাম জ্যোতিঃহীনচক্ষুর কাতর দৃষ্টি—আমাদের জন্মভূমি।" এর পাশেই আবার নিতান্ত লঘু চলিত রীতি,—"আমরা দেখি, শৌচ করে না আচমন করে না, যা-তা খায়, বাছবিচার নাই, মদ খেয়ে মেয়ে বগলে ধেই ধেই নাচ,—এ জাতের মধ্যে কি ভালারে বাপু!"

বিবেকানন্দের চলিত গদ্যরীতির গতিশীলতা বোঝাবার জন্যে কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে।—

(ক) "আর ঐ যে মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে, ঢোঁক গিলে গিলে কথা কয়, ছেঁড়া-ন্যাতা সাতদিন উপবাসীর মত সরু আওয়াজ, সাত চড়ে কথা কয় না, ওগুলো হচ্ছে তমোগুণ, ওগুলো মৃত্যুর চিহ্ন, ও সত্ত্বগুণ নয়, ও পচা দুর্গন্ধ।"

(খ) "এ পোষাক গড়া এক প্রকাণ্ড বিদ্যে হয়ে দাঁড়িয়েছে। কোন্ মেয়ের গায়ের, চুলের রঙের সঙ্গে, কোন্ রঙের কাপড় সাজন্ত হবে ; কার শরীরের কোন্ গড়নটা ঢাকতে হবে, কোন্‌টা বা পরিস্ফুট করতে হবে, ইত্যাদি অনেক মাথা ঘামিয়ে পোষাক তৈরী হয়।"

(গ) "এক পক্ষ বলছেন যে, ছাগল খেলে ছাগুলে বুদ্ধি হয়, শূয়োর খেলে শূয়োরের বুদ্ধি হয়, মাছ খেলে মেছো বুদ্ধি হবে।

অপর-পক্ষ বলছেন যে, কপি খেলে কোপোবুদ্ধি, আলু খেলে আলুয়ো বুদ্ধি এবং ভাত খেলে ভেতো বুদ্ধি।"

(ঘ) "পাশ্চাত্য দেশের মেয়েদের পা দেখানো বড়ই লজ্জা। কিন্তু গলা ও বুকের খানিকটা দেখান যেতে পারে। আমাদের দেশে মুখ দেখানো বড়ই লজ্জা। কিন্তু সে ঘোমটা টানার চোটে সাড়ী কোমরে ওঠেন উঠুন, তার দোষ নাই। রাজপুতনার ও হিমাচলের অষ্টাঙ্গ ঢেকে তলপেট দেখান!"

কয়েকটি শব্দপ্রয়োগের দৃষ্টান্ত, যেমন—

মিন্‌মিনে পিন্‌পিনে, চেতানো, খাজা আহম্মক, ভাঁওতা, ব্যারাম-ফ্যারাম, খিস্তি, অতি ছেবলা, নেংটিনাচ, ফাঁফর, ছুট্‌কো ছাট্‌কা,—ইত্যাদি।

কয়েকটি পদবন্ধ বা বাক্যাংশ, যথা—

আর এক কথা বোঝ দাদা, হাত পা পেটের মধ্যে সেঁধুচ্ছে, পোড়া যমও তাই বাগ্ পেয়েছে, ঘোড়ার ডিম বুঝেছেন, মহা গেরোর উপর গেরো, কচুপোড়া বাক্যিচচ্চড়ি, ব্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুঝবো ক্যামনে—ইত্যাদি।

৪

প্রবন্ধ ধারার বিবর্তন

উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সাহিত্যে গদ্যের প্রবর্তনা এবং ক্রম পরিণতির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা প্রবন্ধের অঙ্কুর দেখা যায়। প্রবন্ধ বলতে আমরা যা বুঝি, তা মধ্যযুগে পদ্য-সন্দর্ভের মধ্যে আত্মগোপন করে থাকলেও সাহিত্যে গদ্যের যুগেই তার যথার্থ আত্মপ্রকাশ। প্রাগ্‌বঙ্কিম যুগে প্রবন্ধ সাহিত্যরস বহন না করলেও সেগুলিকে একটু উদার দৃষ্টি নিয়ে প্রবন্ধ নামে চিহ্নিত করতে পারি। 'সমাচার দর্পণে' বাংলায় জ্ঞান বিজ্ঞান মূলক কিছু রচনা দেখা যায়। অনেকে এগুলিকে বাংলা প্রবন্ধের আদি হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে বা মধ্যভাগে সাময়িক পত্রকে অবলম্বন করে বিভিন্ন প্রবন্ধের প্রকাশ ঘটেছে। সম্বাদ কৌমুদী, সমাচার চন্দ্রিকা, সংবাদ প্রভাকর, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, বিবিধার্থ সংগ্রহ ইত্যাদি বিভিন্ন পত্রিকার মধ্যে ধর্ম, সমাজ, বিজ্ঞান, সাহিত্য ইত্যাদি বিষয়ক বিভিন্ন প্রবন্ধ দেখা যায়। বিভিন্ন সংবাদ পত্রে প্রচুর অজ্ঞাত ও অখ্যাত প্রাবন্ধিকের রচনা স্থান পেয়েছে—সাহিত্যের ইতিহাসে যাঁরা

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজীয় লেখক মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধ চন্দ্রিকা গ্রন্থে প্রবন্ধ রচনার চেষ্টা থাকলেও গদ্যের অপূর্ণতা এবং রীতি সচেতনতার জন্যে এগুলিকে প্রবন্ধ নামে চিহ্নিত করা বিবেচনার বিষয়। মৃত্যুঞ্জয়ের পর প্রবন্ধধর্মী রচনার কথা স্মরণ করলে রাম-

মোহনের রচনাই উল্লেখযোগ্য। রামমোহনের প্রবন্ধ সাহিত্য রস-যুক্ত না হলেও প্রবন্ধের যে বিশেষ ধারাটিকে বস্তুকেন্দ্রিক প্রবন্ধ বলা হয়ে থাকে, সেই আদর্শের বিচারে দেখা যায় যে, রামমোহনের বিতর্ক ও বিচার মূলক প্রবন্ধের মধ্যে যুক্তিনিষ্ঠ প্রণালী ও বাক্‌সংযম এই ধারার বাংলা প্রবন্ধের পরিণতি দানে যথেষ্ট সহায়তা করেছে। তাঁর প্রবন্ধের বৈশিষ্ট্য যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্য এবং মাঝে মাঝে শ্লেষাত্মক বক্তব্যের অবকাশ সৃষ্টি।

রামমোহনের প্রতিদ্বন্দ্বী রক্ষণশীল গদ্যলেখক ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কিছু প্রবন্ধে সাহিত্যেরস থাকলেও তা ব্যঙ্গাত্মক এবং তাঁর প্রবন্ধে যুক্তিনিষ্ঠতাও অপেক্ষাকৃত কম। প্রাগ্‌বঙ্কিম বাংলা প্রবন্ধে সাহিত্যগুণ যে কয়েকজন প্রাবন্ধিকের মধ্যে অবস্থান করেছে, তার মধ্যে ভবানীচরণের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে।

এ যুগের অন্যতম প্রাবন্ধিক ছিলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। তাঁর দর্শন ও বিজ্ঞান বিষয়ক রচনাগুলির মধ্যে প্রবন্ধের আক্রমণাত্মকতা অনুপস্থিত। বরং বিবরণাত্মকতা এসে তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে একটি নতুন ধর্মের সূত্রপাত করলো যা আদি প্রবন্ধগুলির মধ্যে ক্ষীণভাবে অবস্থান করছিলো। তাঁর প্রবন্ধ শুধুমাত্র বিবরণ প্রদানেই ক্ষান্ত হয় নি, পাঠকের চিন্তাশক্তিকে উজ্জীবিত করতে বা জ্ঞানস্পৃহা বৃদ্ধি করতে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

অক্ষয়কুমারের পরে উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক হিসেবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নাম স্মরণীয়। তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক রচনাবলী এবং 'সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' গ্রন্থটি এ যুগের শ্রেষ্ঠ প্রবন্ধ বলে কেউ কেউ অভিহিত করেছেন। বিদ্যাসাগরের গদ্যে চিন্তা ও অনুভূতির ভারবহণ ক্ষমতালাভ সমাপ্ত হয়েছে। ভারবহণ ক্ষমতা অর্জিত হলেও গতিশক্তির কিছুটা প্রয়োজন সেযুগে ছিলো। তবে বস্তুধর্মী প্রবন্ধে এই অভাবও সহনশীলতা সৃষ্টি করে। রাম-

মোহনের মতো বিদ্যাসাগরের প্রবন্ধেও যুক্তি ও শাস্ত্রবাক্য আছে। তবে রামমোহনের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের পার্থক্য এই যে, বিদ্যাসাগর প্রদত্ত যুক্তি শুধু শাস্ত্র-সমর্থিতই নয়, হৃদয়ের উত্তাপ, আবেগ এবং করুণার স্পর্শে প্রকারান্তরে তাঁর প্রদত্ত যুক্তিগুলির শক্তি ও সামর্থ্যের বৃদ্ধি ঘটেছে। হৃদয়াবেগের স্পর্শে প্রাগ্ বঙ্কিম যুগের প্রবন্ধ হয়েও তাঁর প্রবন্ধগুলি সাহিত্যরস সৃষ্টি করেছে। প্রবন্ধ যেহেতু সাহিত্যেরই একটি শাখা, সুতরাং সাহিত্যে উদ্দেশ্য যে রসসৃষ্টি,—তা প্রবন্ধের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। পূর্বোক্ত সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাস বিষয়ক গ্রন্থটিতে বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম প্রাচ্য আলঙ্কারিকদের সমালোচনা পদ্ধতি ত্যাগ করে পাশ্চাত্য সমালোচনা পদ্ধতি গ্রহণ করেছেন। সমালোচনা সাহিত্যে ইতিহাসেও তা প্রথম পদক্ষেপ।

এ যুগে আরও কয়েকজন উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক ছিলেন—যেমন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, রাজনারায়ণ বসু প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধসমূহ রক্ষণশীল ও চিন্তামূলক। ইতিপূর্বে আলোচিত রক্ষণশীল প্রাবন্ধিক ভবানীচরণ যুক্তিকে বিদ্রূপের মধ্যে দিয়ে ভাসিয়ে দিতে চেয়েছেন, কিন্তু ভূদেব মুখোপাধ্যায় শান্ত সংযত চিত্তে এবং তদনুযায়ী ভাষায় যুক্তিনিষ্ঠতাকে সর্বাগ্রে মূল্য দিয়েছেন। প্রাবন্ধিক ভূদেব রক্ষণশীল হলেও তাঁর নীতিকে ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার ওপরে প্রতিষ্ঠিত করে প্রচার করায় অন্যান্য রক্ষণশীল প্রাবন্ধিকের নীতি প্রচারের তুলনায় অনেকটা বাস্তবধর্মী হয়েছে। ভূদেব তাঁর রচনার বহু স্থানে কথোপকথনের রীতি প্রয়োগ করেছেন। ফলে প্রবন্ধে এসেছে আন্তরিকতার স্পর্শ।

রাজনারায়ণ বসুর প্রবন্ধে পাণ্ডিত্য ও সরলতার সমন্বয় দেখা যায়। তাঁর পাণ্ডিত্যের মূলে ছিলো ঐতিহ্য-প্রেম। প্রকাশভঙ্গীর সারল্য তাঁর সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যেই গৃহীত। 'সেকাল আর একাল' প্রবন্ধের

প্রারম্ভে কৃত মন্তব্যেই তার পরিচয় পাওয়া যায়।—"বস্তুতঃ আমি আপনাদিগের সহিত কৌতুক ও আমোদ করিব বলিয়াই অদ্য এখানে আগমন করিয়াছি। যেমন সমস্ত দিবস কঠিন পরিশ্রম করিয়া, লোকে সন্ধ্যার সময় প্রিয় বন্ধুদিগের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিয়া শ্রান্তি দূর করে, তদ্রূপ আমি হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠতা বিষয়ক বক্তৃতার নিমিত্ত শাস্ত্রান্বেষণ প্রভৃতি কঠিন পরিশ্রম করিয়া, আপনাদের সহিত বিশুদ্ধ আমোদ উপভোগ করিবার জন্য অদ্য এই প্রসঙ্গের উত্থাপন করিতেছি। কিন্তু ভরসা করি, অদ্যকার বক্তৃতা কেবল আমোদজনক হইবে, এমন নহে, ইহাতে উপকারও লাভ হইতে পারিবে।"

তত্ত্বজ্ঞ দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রে যথারীতি গাম্ভীর্য রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে মাধুর্যেরও সৃষ্টি ঘটিয়েছেন। ভাবুকতা, আন্তরিকতা ও শান্ত সৌন্দর্যে তাঁর প্রবন্ধগুলি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছে। সমসাময়িক কালের যুক্তিনিষ্ঠতার প্রাধান্য তাঁর প্রবন্ধে অনুপস্থিত, তবে গভীর অনুভূতি, সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ এবং কল্পনাশক্তির প্রাধান্য তাতে দেখা যায়। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধে যে উপাদানগুলি লক্ষ্য করি, তার আভাসিত রূপ দেবেন্দ্রনাথের প্রবন্ধে আছে। প্রবন্ধগুলি মূলতঃ ধর্ম ও নীতি বিষয়ক। সংস্কৃত শ্লোক ইত্যাদির ব্যাখ্যার মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করলেও ভাষার প্রাঞ্জলতার গুণে প্রবন্ধগুলি সাহিত্যধর্ম থেকে বিচ্যুত নয়।

বস্তুতঃ বঙ্কিমচন্দ্রের হাতেই বাংলা প্রবন্ধের পরিপূর্ণতা। প্রবন্ধের প্রকাশভঙ্গীর জন্যে প্রয়োজনীয় গদ্যরীতিও ইতিমধ্যে তাঁর হাতেই পরিপূর্ণতা লাভ করে। প্রবন্ধ দুই প্রকার—বস্তুধর্মী এবং আত্মধর্মী। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে আত্মসচেতনতার জন্মের সঙ্গে একদিকে যেমন গীতি-কবিতার জন্ম হয়েছে, তেমনি আত্মধর্মী বাংলা প্রবন্ধেরও জন্ম হয়েছে। বঙ্কিমের হাতেই প্রকৃত পক্ষে আত্মধর্মী প্রবন্ধের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা—যদিও আত্মধর্মী প্রবন্ধের বীজ প্রাগ্‌বঙ্কিম অনেক প্রাবন্ধিকের

রচনায় লক্ষিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র কিছু আত্মধর্মী প্রবন্ধ লিখলেও বস্তুধর্মী প্রবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও আদর্শস্থানীয় ছিলেন। প্রবন্ধকে ভাব ও ভাষা উভয় দিক থেকেই তিনি সাহিত্য পদ-বাচ্য করে তুলেছেন। চিন্তা ও যুক্তি প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সংযম প্রবন্ধের মধ্যেও এনেছে সংহতি এবং প্রবন্ধ অর্থাৎ প্রকৃষ্ট বন্ধ তাঁর প্রবন্ধেই দেখা যায়। এতোদিন প্রাবন্ধিকবৃন্দ চিন্তা প্রকাশের দিকেই সর্বপ্রকার মনোযোগ নিয়োগ করতেন বলে প্রকাশভঙ্গী ছিলো অবহেলিত। বঙ্কিমচন্দ্র প্রকাশভঙ্গী সম্পর্কেও সচেতন ছিলেন। প্রবন্ধে রস সৃষ্টির জন্যে অনেকে কুরুচি ও ব্যঙ্গাত্মকতার আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু বঙ্কিমের প্রবন্ধে অবকাশনুযায়ী humour-এর সৃষ্টি দেখা যায়। সমালোচনা জাতীয় প্রবন্ধে তাঁর নিরপেক্ষতা, সমালোচ্য বিষয় ও পাঠকের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা সৃষ্টির প্রয়াস, রস-সৃষ্টি ইত্যাদি সর্বপ্রথম পরিলক্ষিত হয়। তুলনামূলক পদ্ধতির প্রয়োগও তাঁর প্রবন্ধেই প্রথম দেখা যায়। ইতিহাস, সমাজ, ধর্ম, সাহিত্য, বিজ্ঞান, অর্থনীতি—যা নিয়েই তিনি প্রবন্ধ রচনা করুন না কেন, তাঁর মূল সুর দেশ-প্রেম প্রবন্ধগুলিকে একটি স্বতন্ত্র আস্বাদ দিয়েছে।

বঙ্কিম সমসাময়িক কালে আরও অনেক প্রাবন্ধিক তাঁদের প্রবন্ধের মাধ্যমে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন। সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে রম্যরস ও চিত্রধর্মিতা, কোথাও বা কবিত্বের পরিচয় আছে। শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রবন্ধে তাঁর রীতির সারল্য আমাদের আকর্ষণ করে। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রবন্ধে কোথাও পাণ্ডিত্য, কোথাও বা কৌতুক পাঠককে বিস্মিত ও স্মিত করে। কেশবচন্দ্র সেনের প্রবন্ধে আমরা লক্ষ্য করি তাঁর প্রকাশভঙ্গীর সরসতা ও সারল্য। রজনীকান্ত গুপ্তের প্রবন্ধে পাওয়া যায় ঐতিহাসিকতা ও দেশপ্রেমের সমন্বয়। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর গবেষক মনোবৃত্তি তাঁর প্রবন্ধগুলিকে বিশিষ্ট করেছে। চন্দ্রশেখর মুখোপাধ্যায়ের প্রবন্ধের আবেগধর্মিতা এবং দ্বিজেন্দ্রনাথ

ঠাকুরের প্রবন্ধে তত্ত্বধর্মিতা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। পূর্ণচন্দ্র বসুর সাহিত্য সমালোচনার রীতি সমকালীন প্রবন্ধগুলির মধ্যে বিশিষ্ট। প্রবন্ধে অক্ষয়-ভূদেব-বিদ্যাসাগরের অনুবর্তন কালীপ্রসন্ন ঘোষের রচনায় এবং প্রবন্ধে বঙ্কিমের অনুবর্তন অক্ষয়চন্দ্র সরকারের রচনায় পরিলক্ষিত হয়। এ যুগে চন্দ্রনাথ বসু, চন্দ্রশেখর বসু, প্রফুল্লচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, যোগেন্দ্রচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, জগদীশনাথ রায়, রামদাস সেন, রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়, ঠাকুরদাস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ অনেক প্রাবন্ধিক তাঁদের প্রবন্ধ রচনার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা অর্জন করেছেন।

বাংলা প্রবন্ধের বিবর্তন ও আদর্শ-বৈচিত্র্যের মধ্যেই বিবেকানন্দের প্রবন্ধ সমূহ রচিত হয়েছে। বলা বাহুল্য তাঁর প্রবন্ধরীতিতে সমকালীন প্রাবন্ধিকবর্গের প্রভাব থাকাও বিচিত্র নয়।

৫

বিবেকানন্দের প্রবন্ধরীতির বৈশিষ্ট্য

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হয়ে যে কয়েকজন প্রাবন্ধিক বঙ্কিমযুগে এবং প্রাক্‌সবুজপত্র যুগে বিশিষ্টতা অর্জন করেছেন, তাঁদের মধ্যে বিবেকানন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি সাধকরূপে আমাদের কাছে অতিরিক্ত মূল্য পাওয়ায়, তাঁর সাহিত্যকৃতির দিকটি সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছে। সাহিত্যসৃষ্টির প্রেরণা যদি তাঁর রচনা ক্ষমতার সঙ্গে সংযুক্ত হতো, তাহলে প্রবন্ধের ক্ষেত্রে তাঁর দান সাহিত্য ধারাকে আরও এগিয়ে দিতো। তাঁর অদ্ভুত চিন্তাশীলতা, বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণ ক্ষমতা, সমাজ ও দেশকাল সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান এবং বাংলা গদ্যরীতির বিস্ময়কর শক্তি সে যুগে প্রাবন্ধিকদের মধ্যে সহজেই তাঁর স্থান চিহ্নিত করে দিয়েছে।

ধর্ম বিবেকানন্দের প্রবন্ধের মূল সুর। প্রাগ্‌-বিবেকানন্দ বাংলা সাহিত্যে রামমোহন রায়ের যুগ থেকেই ধর্মীয় প্রবন্ধের সৃষ্টি দেখা যায়। এই ধর্মীয় প্রবন্ধগুলির কোনো কোনোটিতে প্রগতিশীলতার বাস্তবতার অভাব থাকায় গত শতাব্দীর দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে সেগুলির বিযুক্তি স্পষ্ট-গোচর। তাছাড়া প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিভঙ্গীর স্বচ্ছতা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ধর্মীয় সংস্কারে আচ্ছন্ন। বিবেকানন্দের প্রবন্ধে ধর্মের প্রাধান্য স্বীকৃত হলেও একদিকে প্রাবন্ধিকের দৃষ্টিভঙ্গী যেমন আচ্ছন্ন নয়, তেমনি যুগোপযোগী প্রগতিশীলতা ও বাস্তবতার মূল্য স্বীকৃত হওয়ায় তা সমকালীন অন্যান্য জাতীয় প্রবন্ধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করছে ; এমন

কি ধর্মীয় হয়েও প্রবন্ধগুলি সামাজিক, রাজনৈতিক বা সাহিত্যিক প্রবন্ধের চেয়েও আধুনিকতা রক্ষা করেছে।

সাধারণতঃ ধর্মীয় প্রবন্ধের লেখক অতীতমুখীন হন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অতীতের মতবাদগুলিকে সর্বস্ব জ্ঞান করে বর্তমানকে ঘৃণার সঙ্গে অস্বীকার করেন। কিন্তু বিবেকানন্দের ধর্মীয় প্রবন্ধে বর্তমান সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান, জাতীয় পরিধি ও আন্তর্জাতিক পরিধিকে তুলে ধরবার উদারতা সব কিছুই সাধারণের কাছে তাঁর প্রবন্ধকে আকর্ষক করে তুলেছে। সংস্কারমুক্তভাবে ধর্মকে বিশ্বের সমকালীন চিন্তাধারার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে বিচার করে আমাদের ধর্ম-চেতনার মধ্যে ব্যাপ্তি আনবার প্রয়াস বিবেকানন্দের প্রবন্ধে দেখা যায়।

ধর্মীয় প্রবন্ধে বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ বস্তুনিষ্ঠতার পরিচয় দিয়েছেন। বিজ্ঞান চর্চার ফলে আমাদের দেশে বৈজ্ঞানিক মূল্যে সব কিছু বিচারের প্রবণতা দেখা যায়। ফলে এই মূল্য অস্বীকার করে ধর্মীয় প্রবন্ধগুলি যুক্তিপূর্ণতা সত্ত্বেও শুধুমাত্র পদ্ধতিগত ত্রুটির জন্যে অনেকটা কোণঠাসা হয়ে পড়েছিলো। বস্তুনিষ্ঠ এবং বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে ধর্মীয় প্রবন্ধকে বিবেকানন্দ এই অমর্যাদা থেকে রক্ষা করেন।

ধর্মের সঙ্গে সংস্কৃতিকে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িত করে বিভিন্ন রচনায় তিনি তাঁর আকর্ষণকে ব্যক্ত করেছেন। সংস্কৃতির প্রতি আকর্ষণও তাই তাঁর প্রবন্ধে ব্যক্ত হয়েছে। ঐতিহ্যের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধা তাঁকে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। বহির্জগৎ সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান তাঁকে তুলনামূলক বিচারে প্রবৃত্ত করেছে। বৈদেশিক ভাবধারার শ্রেষ্ঠ অংশ গ্রহণ করতে বলবার মতো উদারতা তাঁর ছিলো এবং সব কিছুরই মূলে ছিলো সাংস্কৃতিক উন্নতি বিধানের চেষ্টা। তবে পূর্বোক্ত বৈদেশিক ভাবধারাকে তিনি জাতীয় লুপ্ত ভাবধারার পুনরুজ্জীবনের জন্যেই গ্রহণ

করতে বলেছেন। আমাদের নিজস্ব ভাবধারার প্রতি আমাদের দায়িত্বহীনতাকে তিনি কঠোরভাবে সমালোচনা করতেও ইতস্ততঃ বোধ করেন নি। ঐতিহ্যপ্রেমের সঙ্গে এই উদার দৃষ্টি তাঁর প্রবন্ধকে ভাবের দিক থেকে অনেকটা আধুনিতার পথে নিয়ে গেছে। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধবিধৃত ভাবের সঙ্গে এইভাবে যোগসূত্র রক্ষা করেছে।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে, বঙ্কিমী পদ্ধতি গ্রহণ করেও প্রগতিশীল ভাবকে ব্যক্ত করে বিবেকানন্দ প্রবন্ধের ধারায় বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের মধ্যে সেতুবন্ধন করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর ভাবের ক্রমবিকাশ পর্যবেক্ষণের ক্ষেত্রে বিবেকানন্দের প্রবন্ধাবলী তাই অপরিহার্য।

শুধু তত্ত্বমূলক প্রবন্ধরূপে নয়, সাধারণ প্রবন্ধরূপেও বিবেকানন্দের প্রবন্ধ অনেকটা সাধারণের উপযোগী করে লেখা। প্রবন্ধমাত্রেই পণ্ডিত ও জ্ঞানী সমাজের জন্যে লেখা উচিত, এই ধারণায় অনেকে পাঠকের সঙ্গে পাণ্ডিত্যের প্রতিযোগিতায় নামেন এবং প্রবন্ধকে দুর্বোধ্য করে তোলেন। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণের শিক্ষা বিবেকানন্দের প্রবন্ধকে বিশিষ্ট করে তুলেছে। শুধুমাত্র প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে নয়, বিষয়বস্তুর দিক থেকেও তিনি কল্যাণ ও ব্যাপ্তির কথা চিন্তা করেই প্রবন্ধ লিখেছেন এবং সাহিত্য রচনার ক্ষেত্রে যাঁরা ব্যাপ্তিকে মূল্য দেন, তাঁদের সাহিত্য বিচারের মানদণ্ডে তাঁর প্রবন্ধাবলীর যথেষ্ট মূল্য আছে।

ধর্ম সমাজ ও রাষ্ট্রকে বিবেকানন্দ সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ করে সাধারণের মধ্যে সাংস্কৃতিক চেতনাকে জাগিয়ে তুলতে চেয়েছেন। তাঁর উদ্দেশ্যকে তাঁর প্রকাশভঙ্গী সহায়তা করায় তিনি তাঁর দিক থেকে অনেকটা সার্থক, তা সমালোচকবর্গ এক বাক্যে স্বীকার করবেন। তাঁর আকর্ষণ অনর্থক স্তুতিকে প্রশ্রয় দেয় নি, তাঁর বিমুখতা শালীনতাকে বিনষ্ট করে নি। তাঁর হাস্যরস সৃষ্টি রুচি-দুষ্টি ঘটায় নি, তাঁর জ্ঞান অহংকার প্রকাশের চেষ্টা করে নি।

বিবেকানন্দের প্রবন্ধের ভাষা, সাধু এবং চলিত—উভয় রীতির ক্ষেত্রেই সমালোচক-বর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। অলঙ্কার প্রয়োগের স্বাভাবিকতা ও শব্দ-চেতনার ক্ষেত্রে সামাজিকতা তার গদ্যরীতির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে প্রবন্ধকে সমকালীন প্রবন্ধধারার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র স্থানই যে দিয়েছে তা নয়, প্রবন্ধধারাকে আধুনিকতার দিকে পদক্ষেপ করতে অনেকটা সহায়তা করেছে।

৬

প্রবন্ধ স্বরূপ—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ থেকে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রাচ্য ভাবধারাকে প্রভাবিত করে এবং আমাদের জাতীয় জীবনে এর ফলে একটি বিরাট পরিবর্তন সূচিত হয়। একদিকে পাশ্চাত্য ভাবধারার মোহে অন্ধ এক দল জাতীয় সবকিছুর মূলে কুঠারঘাত করবার চেষ্টা করেছেন, অন্যদিকে তেমনি আর একটি দল রক্ষণশীল মনোবৃত্তির চাপে জাতীয় কুসংস্কারগুলি সমেত সব কিছুকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছেন! এই দুইটি ধারার মধ্যে তৃতীয় ধারার জন্ম হলো—যে ধারাকে সমন্বয়পন্থী ধারা বলতে পারি। সমন্বয়ের মধ্যে দিয়ে এই ধারা পরিপুষ্টি ও দৃঢ় ভিত্তি লাভ করেছে। এই সমন্বয়ের প্রতিষ্ঠাভূমি ছিলো দেশীয় ভাবধারা। তাই সেই ভাবধারার আলোকে ধর্ম সমাজ এবং রাষ্ট্রীয় দিক থেকে সংস্কার-চেতনা এসে দেখা দিয়েছে। এর সঙ্গে এসেছে দেশাত্মবোধ ও মানবতাবাদ।

রামমোহনের যুগ থেকেই প্রাচ্য এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার সূত্রপাত হয়। সিপাহী বিপ্লবের পর থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার স্বরূপ উদ্‌ঘাটনে ব্যাপকভাবে প্রয়াস দেখা দিলো। এই সময় শাসক বিদ্বেষ থেকে পাশ্চাত্য ভাবধারার প্রতিও বিদ্বিষ্ট মনোভাবের জন্ম হয়। ফলে উভয় ভাবধারা স্বতন্ত্র এবং এই দুই ধারার কোনো মিল সম্ভব নয়—এটা অনেকে বিশ্বাস করলেন।

এই যুগেই বস্তুনিষ্ঠ এবং সমন্বয়পন্থী দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে বিবেকানন্দ

উভয় ভাবধারা বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জীবনদর্শনে দুইটি ভাবধারার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিজ জীবনদর্শনে দুইটি ভাবধারার সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করলেও প্রত্যক্ষভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারার সমালোচনা করেন নি। ভারতীয় ও ইউরোপীয় শাস্ত্র ও দর্শন মিলিয়ে তিনি একটি নিজস্ব ধারণার সৃষ্টি করে গেছেন। গীতার নিষ্কাম কর্মযোগের সঙ্গে পাশ্চাত্য হিতবাদকে মিলিয়ে সমাজ মূল্যায়িত নতুন ধর্মকে প্রাধান্য দিয়েছেন। কিন্তু তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মত ও পথের মধ্যে কোনটি গ্রহণীয় এবং কোনটি বর্জনীয়—তা নির্দেশ করেন নি। যে যুগে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে একদল রাজনীতিবিদ্ ও সমাজ সংস্কারক পাশ্চাত্য সভ্যতা ও ভাবধারাকে সর্বপ্রকারে হেয় প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করেছিলেন, সেযুগে পাশ্চাত্য সভ্যতা থেকে গ্রহণীয় বিষয়গুলি নির্দেশ করে তিনি অনেকটা দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন।

পাশ্চাত্য-সভ্যতাকে আমরা অনেকটা বিরূপ দৃষ্টি নিয়ে দেখেছি, তার কারণ আছে। পাশ্চাত্য সভ্যতার দূত হয়ে যারা আমাদের কাছে এসে উপস্থিত হয়েছে, তারা বণিক এবং সাম্রাজ্যবাদী। পাশ্চাত্য সাহিত্য পাঠের মাধ্যমে তাদের কাছ থেকে আমাদের প্রত্যাশা যতোই জাগছিল, তাদের শাসনপ্রণালীর মধ্যে দিয়ে সেই প্রত্যাশার ওপরে নিয়ত এসেছে আঘাত। শাসকদের শোষণ ও দমননীতি ক্রমে ক্রমে তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধাকে নষ্ট করেছে। শাসনের স্বার্থে তারা আমাদের জাতীয় ইতিহাসকেও করেছে বিকৃত। ফলে শাসকদের প্রতি বিরূপতা থেকে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি একটি বিতৃষ্ণা এযুগে ক্রমেই জেগে উঠেছিল। ফলে পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রসঙ্গে অনেকেই নিরপেক্ষভাবে বিচার করতে পারেন নি।

রাজনীতির সংযুক্তিবিহীন কয়েকজন ব্যক্তিই নিরপেক্ষভাবে পাশ্চাত্য ভাবধারাকে সন্দর্শন করতে পেরেছিলেন। তাঁদের মধ্যে

বিবেকানন্দ ছাড়াও রবীন্দ্রনাথ ও প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখযোগ্য। এই তিনজনের আলোচনার মধ্যেও বিবেকানন্দের স্বাতন্ত্র্য দৃষ্টি-আকর্ষণ করে।

রবীন্দ্রনাথ পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছেন ইংরিজী সাহিত্যের মাধ্যমে। পরে পাশ্চাত্য জগৎ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা তাঁর কল্পনাকে বাস্তবতা দিয়ে অনেকটা পরিশুদ্ধ করে। ইউরোপ সম্পর্কে একটি সশ্রদ্ধ চেতনা তার মধ্যে বিদ্যমান ছিল। 'পথের সঞ্চয়' বা 'রাশিয়ার চিঠি'তে সেই শ্রদ্ধার ভাবধর্মী প্রকাশ দেখা যায়। অবশ্য শেষ জীবনে ইংরেজদের বর্বরতা তাঁর চিত্তকে ইউরোপ সম্পর্কে মোহমুক্ত করেছিলো,—'সভ্যতার সঙ্কট' ইত্যাদি প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তা প্রমাণিত হয়।

রবীন্দ্রনাথ কবি এবং ভাবুক। তাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে তাঁর বিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টির প্রয়োজন তিনি উপলব্ধি করেন নি। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাবধারায় এই অমিল কেন, তা তিনি ভাবুকের দৃষ্টি দিয়েই নির্ধারণ করেছেন। তাঁর East and West (Creative Unity) কিংবা 'পূর্ব ও পশ্চিম' (সঞ্চয়) ইত্যাদি প্রবন্ধে তা প্রকাশ পেয়েছে। তিনি বলেছেন,—পাশ্চাত্য জাতি শুধু বিজ্ঞান আর যন্ত্র নিয়ে এসেছে, মনুষ্যত্ব ও হৃদয় নিয়ে আসেনি। তাই দুইয়ের মিলন সম্ভব হচ্ছে না। যদি ইউরোপ হৃদয় এবং অপরকে বোঝাবার মতো ঔদার্য নিয়ে আসে, তাহলেই এই মিলন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হবে। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, আমাদের অধ্যাত্ম-শক্তি, পাশ্চাত্য কর্ম, আমাদের জ্ঞান ও প্রেম—দুইয়ে মিলে মানব সভ্যতার চরম উৎকর্ষ সাধিত হবে।

প্রমথ চৌধুরী প্রথম মহাযুদ্ধের সমসাময়িককালে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনা করে কয়েকটি প্রবন্ধ রচনা করেন। 'পূর্ব ও পশ্চিম' এবং 'ইউরোপীয় সভ্যতা বস্তু কি' প্রবন্ধ

দুটি কয়েকজন পাশ্চাত্য লেখকের গ্রন্থকে উপলক্ষ করে সমালোচনা জাতীয় প্রবন্ধ। 'আমরা ও তোমরা' প্রবন্ধে তিনি বীরবলী রীতিতে উভয় সভ্যতার বৈপরীত্য প্রদর্শন করেছেন। বৈপরীত্য প্রদর্শন করে প্রাচ্যপক্ষ সমর্থন করায় তিনি তাতে সমন্বয়ের কোনো পদক্ষেপ ঘটাতে পারেন নি।

কিন্তু বিবেকানন্দের পদ্ধতি স্বতন্ত্র। তিনি প্রথম থেকেই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জীবনধারার পার্থক্য এবং তার কারণ বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থিত করেছেন। ইতিহাস, জাতিতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে সাধারণ দৈনন্দিন জীবনযাত্রার প্রসঙ্গ এনে সবদিক থেকেই তুলনা করবার চেষ্টা করেছেন। উভয় সভ্যতারই কুসংস্কার ও কুপ্রথাকে তিনি তীব্রতম ভাষায় আক্রমণ করেছেন। এর মধ্যে দিয়ে তাঁর উভয় সভ্যতা সম্পর্কে ঘনিষ্ঠ পরিচয়েরই ইঙ্গিত পাই। বিবেকানন্দের রচনা বিষয়বস্তুর দিক থেকে অনেক বেশি ব্যাপকতাকে যেমন আশ্রয় করেছে, তেমনি পাঠকের পরিধি বিচারেও অনেক বেশি ব্যাপকতাকে মূল্য দিয়েছে।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটি যেন 'পরিব্রাজক' গ্রন্থেরই পরিপূরক। "পরিব্রাজক" ভ্রমণের চিত্র এবং "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য" ভ্রমণলব্ধ জ্ঞান। তাঁর সূক্ষ্মদর্শিতা এই জ্ঞানকে সাধারণ জ্ঞান থেকে অনেক গভীরতর করেছে। পরিব্রাজকের মতো ভ্রমণ চিত্রের সরসতা না থাকলেও চিন্তার সহজ প্রকাশে তা অনবদ্য। গ্রন্থটিতে তাঁর হৃদ্‌বৃত্তি ও চিদ্‌বৃত্তির সহায়তায় তিনি ইতিহাস, অর্থনীতি, দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব ও শিল্পতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর উপলব্ধিকে রূপ দিতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি যেমন তাঁর প্রবন্ধে হৃদয় ও বুদ্ধির ভারসাম্য রক্ষা করেছেন, তেমনি স্বদেশী ও বিদেশী সভ্যতার তুলনার ক্ষেত্রেও ভারসাম্য রক্ষা করেছেন। তিনি নির্ভীকভাবে এ দেশের দোষগুলিকে নির্দেশ করেছেন, তেমনি উদারচিত্তে বিদেশের গুণগুলিকে গ্রহণ করতে

নির্দেশ করেছেন। তাঁর এই নিরপেক্ষতা আদর্শের পরিপুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে সমর্থনপুষ্টিও লাভ করেছে। তুলনামূলক আলোচনার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ ধর্মতত্ত্ব, ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, জাতিতত্ত্ব, দর্শন, সমাজতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, জাতীয় মনস্তত্ত্ব—সব কিছুকেই বিষয়বস্তু রূপে গ্রহণ করেছেন। সাধারণ আচার আচরণকে বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত করে তাঁর বক্তব্যে তিনি বাস্তবতা ও প্রগতিশীলতা এনেছেন।

সাধারণতঃ ধর্মীয় লেখকদের মধ্যে এক প্রকার আচ্ছন্নতা দেখা যায়। কিন্তু বিবেকানন্দ প্রগতিশীল, বাস্তব এবং নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করতে সমর্থ হয়েছেন। তিনি ভারতবর্ষের বহু স্থান পরিভ্রমণ করেছেন, পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন স্থানেও তিনি ভ্রমণ করেছেন। আবার দেখা যায়, তিনি এদেশীয় বিভিন্ন গ্রন্থ যেমন পাঠ করেছেন, তেমনি আগ্রহ সহকারে বিদেশী গ্রন্থও পাঠ করেছেন। ফলে অতি বিস্তৃত প্রত্যক্ষ জ্ঞানের সঙ্গে অগাধ পাণ্ডিত্য সংযুক্ত হয়ে তার উপলব্ধিকে সত্যের পথে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়েছে।

‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ গ্রন্থের চলিত গদ্যের স্টাইল বিস্ময়কর। গদ্য সাহিত্যে চলিত রীতির তেমন প্রচলন না থাকলেও বাংলা সাহিত্যে বহু নাট্যকার তাঁদের সংলাপে চলিত রীতিকে রূপ দিয়ে তার পথ অনেকটা সুগম করেছিলেন। এই রীতির সঙ্গে গ্রন্থের বিষয়বস্তুর আশ্চর্য সহযোগিতা রবীন্দ্রনাথকেও বিস্মিত করেছিলো বলে শোনা যায়। কুমুদবন্ধু সেনের কাছে আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন ‘প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য’ গ্রন্থের একটি কপি রবীন্দ্রনাথের অনুরোধেপড়বার জন্যে চেয়ে নেন।

রবীন্দ্রনাথ নাকি দীনেশচন্দ্র সেনকে বলেন,—“আপনি এখুনি গিয়ে বিবেকানন্দের এই (প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য) বইখানি পড়িবেন। চলিত বাংলা কেমন জীবন্ত প্রাণময়রূপে প্রকাশিত হতে পারে তা পড়িলে বুঝিবেন। যেমন ভাব তেমনি ভাগা, তেমনি সুক্ষ্ম উদার

দৃষ্টি আর পূর্ব-পশ্চিমের সমন্বয়ের আদর্শ দেখে অবাক হতে হয়।” (উদ্বোধন, মাঘ, ১৩৬৪ ; ‘উদ্বোধনের জয়যাত্রা’)।

বলাবাহুল্য, বিবেকানন্দ সাহিত্যিক হিসেবে পরিচিত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর আন্তর প্রেরণা যে ভাবে সাহিত্যিক মনের পথ দিয়ে এই সৃষ্টিকে সম্ভাবিত করেছে, তা বিস্ময়কর। সম্ভবতঃ তাঁর স্বচ্ছ উপলব্ধি ভাষাকে করেছে সহজ এবং স্রষ্টার মনের অগোচরে সেই ভাষা হয়েছে সাহিত্যরসসিক্ত।

৭

ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারা

প্রত্যেকটি দেশের পরিধিতে শতাব্দীর পদক্ষেপ নতুন নতুন চিন্তা-ধারা বহন করে আনে। জাতি সংশ্লেষ, বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের বিকাশ, ব্যক্তিত্বের আপোষে মাত্রা-বিভিন্নতা ইত্যাদি শতাব্দীর চিন্তার মধ্যে পার্থক্য আনে। এই ভাবেই প্রাগাধুনিক যুগের চিন্তাধারার সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর চিন্তাধারার যথেষ্ট পার্থক্য সৃষ্টি হয়েছে। এই পার্থক্যগুলি মূলতঃ কয়েকটি প্রবণতা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হলেও প্রধানতঃ চারটি গোত্রে সেগুলিকে ভাগ করা যায়।—(ক) ধর্মীয় চিন্তা (খ) সামাজিক চিন্তা (গ) রাষ্ট্রীয় চিন্তা (ঘ) শিল্প-চিন্তা।

গত শতাব্দীর চিন্তাধারাকে নিয়ন্ত্রিত করেছে যুক্তিবাদ, স্থানচেতনা কালচেতনা, পাত্রচেতনা। পাত্রচেতনাকে নামান্তরে আত্মমর্যাদা বোধ ও মানবত্বের মর্যাদাবোধ বলতে পারি। এইগুলি পূর্বোক্ত চারটি চিন্তাধারাব মধ্যে পরিবর্তন এনেছে।

ধর্মীয় চিন্তা॥ রামমোহন জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় তৎকালীন ধর্মচর্চা সম্পর্কে লিখেছিলেন,—“বেদের যে সকল কর্মকাণ্ড, উপনিষদের যে ব্রহ্মজ্ঞান, তাহার আদর এখানে কিছুই ছিল না। কিন্তু দুর্গোৎসবের বলিদান, নন্দোৎসবের কীর্তন, দোলযাত্রার আবীর, রথযাত্রার গোল এই সকল লইয়াই লোকের মহা আমোদ ছিল।…গঙ্গাস্নান, ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবে দান, তীর্থভ্রমণ, অনশনাদি দ্বারা তীব্র পাপ হইতে পরিত্রাণ পাওয়া যায়, পবিত্রতা লাভ করা যায়, পুণ্য

অর্জন করা যায়, ইহা সকলের মনে একেবারে স্থির বিশ্বাস ছিল।… অন্নশুদ্ধির উপরেই বিশেষরূপে চিত্তশুদ্ধি নির্ভর করিত।" এই সময়েই একেশ্বর বাদী চিন্তা নিয়ে রামমোহনের আবির্ভাব হয়। অদ্বৈতবাদী ব্রহ্মতত্ত্ব .এবং ইসলামী মোতাজেলা মুওয়াহিদ্দিনী সম্প্রদায়ের তত্ত্বের প্রভাব রামমোহনে থাকতে পারে। তবে তাঁর বেদান্ততত্ত্বকে তিনি ব্যাবহারিক ক্ষেত্র থেকে পৃথক করে দেখেছেন। তাই অনেকে তাঁর একেশ্বরবাদী হিন্দুগ্রন্থ প্রচারের উদ্দেশ্যকে বলেছেন Political advantage and social Comfort." রামমোহনের এই ধর্মচর্চা ছিলো চিন্তা-নির্ভর এবং কেউ কেউ তাতে বিজাতীয়তার পরিচয় পেয়েছেন। তবু তিনি অতি সূক্ষ্ম অধ্যাত্মবাদের সন্ন্যাস বৈরাগ্য ও সর্বপ্রকার গুহ্যসাধনা থেকে জাতিকে মুক্তি দিয়েছেন। শাস্ত্রশাসনের বিরুদ্ধে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যবাদ তাঁর ধর্মচেতনাকে বিশিষ্ট করেছে। এ যুগে কাশীনাথ তর্কপঞ্চানন এবং মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের রক্ষণশীল দৃষ্টিভঙ্গী 'বাংলা ভাষায়' বেদান্ত প্রচারের বিরোধিতা করেছে। পৌত্তলিকতার প্রাচীনতা ও সার্থকতা নিয়েও এযুগে রক্ষণশীল পক্ষের প্রচার যথেষ্ট ছিলো।

দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ধর্মীয় চেতনাকে প্রথম হৃদয়-সম্পৃক্ত করলেন। তিনি রামমোহনের পথে অগ্রসর হয়ে বেদান্ত ধর্মের আনুগত্য নিলেন। তিনি বুঝলেন উপনিষদই বেদের সার ভাগ, তাই বেদের কর্মকাণ্ড সূচক অংশ তিনি বাদ দিলেন। তিনি অবশ্য পূর্বের দিকে বেদ অপৌরুষেয় বলে বিশ্বাস করতেন। অক্ষয়কুমার দত্তের সংস্পর্শে এসে সে ধারণা নষ্ট হয়। এই সময়ে মায়াবাদ ও. অদ্বৈতবাদের প্রতি দেবেন্দ্রনাথের বিতৃষ্ণা দেখা যায়। বিশেষ করে বেদান্তের শাঙ্কর ভাষ্যে তাঁর আস্থা তেমন ছিলো না। তবু বেদান্তে তাঁর আনুগত্য ছিলো এবং এর মধ্যে দিয়ে সমগ্র ভারতের ধর্মের মধ্যে ঐক্য আনবার উদ্দেশ্য ছিলো। তিনি ব্রহ্মপ্রতিপাদক উপনিষদকেই বেদান্ত ভাবতেন। জীব ব্রহ্মের

পার্থক্যে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন বলেই একই সঙ্গে পৌত্তলিকতা এবং অদ্বৈতবাদের বিরোধিতা করেছেন। তিনি প্রামাণিক অপ্রামাণিক নির্বিশেষে বহু উপনিষদ থেকে পছন্দ মতো শ্লোক সংগ্রহ করেন। সুতরাং ব্যক্তিচিত্তের নিয়ামকতার মধ্যে দিয়ে তিনি বেদান্তকে মূল্য দিয়েছেন, বলা বাহুল্য।

এ যুগে কোঁতের দর্শন আলোচনার জন্যে 'পজিটিভিস্ট ক্লাব' স্থাপিত হয়। কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, দ্বারকানাথ মিত্র, যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তি মানবধর্ম তথা Humanity-কে আমাদের দেশে প্রচারের চেষ্টা করেন, স্বয়ং কোঁৎ Humanity-র সঙ্গে খৃষ্টান সংস্কার জড়িয়েছিলেন, তেমনি এদেশীয় কোঁৎ-পন্থীরাও Humanity-র সঙ্গে হিন্দু সংস্কারকে জড়িয়েছিলেন, যদিও সকলের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। বিদ্যাসাগর মশায় ধর্মের সমাজগত প্রয়োজনটুকুকেই মূল্য দিয়েছেন। সংস্কৃত কলেজের সাধারণ শিক্ষাবিধি থেকে আন্বীক্ষিকী বিদ্যাকে তুলে দেবার সুপারিশের মূলে ছিলো বাস্তবজীবনে এর প্রয়োজনহীনতা। মানুষের আধ্যাত্মিক কল্যাণের চেয়ে বাস্তব কল্যাণের দিকেই তাঁর ঝোঁক ছিলো। প্রচলিত আচার আচরণ মেনে নিলেও সেগুলির প্রতি তাঁর আসক্তি ছিলো না। তিনি ঈশ্বর অবিশ্বাসী হয়তো ছিলেন না, কিন্তু মানবজীবনে তাঁর স্বীকারের মধ্যে দিয়ে সামাজিক কল্যাণ সম্পর্কে তাঁর তেমন আস্থা ছিলো না। সমসাময়িক কালের অন্যতম চিন্তানায়ক প্যারীচাঁদ মিত্র তাঁর আলোচনা গ্রন্থের মধ্যে প্রেততত্ত্ব ও আত্মার অবিনাশত্ব সম্পর্কে আলোচনার পরে অধ্যাত্মবিদ্যা এবং ঈশ্বর তত্ত্বের সঙ্গে জীবতত্ত্বের সম্পর্ক বিষয়ে যে সব আলোচনা করেন, তাতে একদিকে যেমন হিন্দুর ষড়দর্শন ও ব্রহ্মবিদ্যার প্রতি তাঁর নিষ্ঠার পরিচয় মেলে, অন্যদিকে তেমনি কর্ণেল ওলকট ও মাদাম ব্লাভাট্স্কির থিয়োজফির প্রভাবও কম লক্ষিত হয় না। এদেশীয় ব্রহ্মবিদ্যার মাধ্যমে তিনি পাশ্চাত্য

থিয়োজফি বোঝবার চেষ্টা করেছেন। তাই তিনি প্রেততত্ত্বে ও ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বে কোনো বিরোধ উপলব্ধি করেন নি। তাঁর বিশ্বাস ছিলো, ঈশ্বরের স্বতন্ত্র সত্তা সত্ত্বেও সামান্য রূপে তিনি সব বস্তু ও জীবে বিদ্যমান্।

উনিশ শতাব্দীতে ধর্মচিন্তায় আত্মশক্তির নিয়ামকতার প্রতি দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরেরও বিশ্বাস ছিলো। "আপনার চৈতন্য না জানিলে যেমন অন্যের চৈতন্য জানা যায় না—তেমনি আপনার আত্মশক্তি না জানিলে পরমাত্মার নিগূঢ়তত্ত্বের সন্ধান জানা যায় না।"

(অমিয় চক্রবর্তীকে লিখিত পত্র)

যুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দর্শনকে উপলব্ধি করবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর মতে অজ্ঞেয়বাদীরা নাস্তিক ছাড়া কিছু নয়।

দেবেন্দ্রনাথের মতো কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্মধর্মের অন্যতম ধর্মনায়ক হলেও পরস্পরের চিন্তার মধ্যে পার্থক্য ছিলো। দেবেন্দ্রনাথ আত্মনিয়মকতার মধ্যে দিয়ে উপনিষদকে ভিত্তি করে অগ্রসর হয়েছেন শান্ত পদক্ষেপে। কিন্তু কেশবচন্দ্র হৃদয় উপলব্ধির মূল্য দিলেও অতিরিক্ত আবেগে আত্মশক্তির নিয়ামকতা হারিয়ে বিভিন্ন ধর্মের বিভিন্ন আচারের প্রতি অন্ধভাবে ধাবিত হয়েছেন এবং কখনো খৃষ্টান, কখনো বোষ্টম ইত্যাদি বিভিন্ন বিশেষণ বিশিষ্ট হয়েছেন। দেবেন্দ্রনাথের ভিত্তি ছিলো দেশীয় উপাদানের ওপরে এবং কিছুটা প্রচলিত আচারের ওপরে। তাই রক্ষণশীল দল দেবেন্দ্রনাথের চিন্তা পরিধিতে এবং প্রগতিশীল দল কেশবচন্দ্রের চিন্তা পরিধিতে গমন করলেন। সমসাময়িক কালের পাশ্চাত্য মোহকে কেশবচন্দ্র তাঁর ধর্মে কিছুটা স্বীকার করেছেন। সুতরাং কেশবচন্দ্রের আধ্যাত্মিকতা বিভিন্ন উপাদানের আত্মিক নিয়ন্ত্রণে সমন্বয় নয়—বরং একত্রীকরণ বলতে পারি।

কেশবচন্দ্রের ধর্মীয় চিন্তা যখন সমাজে স্তিমিত তখন বঙ্কিমচন্দ্রের

ধর্মীয় চিন্তা সমাজকে প্রভাবিত করেছে। বঙ্কিমচন্দ্র প্রথম যুগে কোঁৎএর দর্শনে প্রভাবিত ছিলেন। পরে তিনি গীতার চিন্তা দিয়ে উক্ত দর্শনকে শোধন করে গ্রহণ করেন। তিনি গীতার নিষ্কাম কর্ম যোগকেই ধর্মসাধনায় প্রধান অঙ্গ বলে মূল্য দিয়েছেন। সকাম কর্মানুষ্ঠান এবং কর্মত্যাগ উভয়ই পরিত্যাজ্য। কিন্তু মানুষ নিষ্কামকর্ম সাধনায় কিছুটা কামনাকে অস্বীকার করতে পারে না। এক্ষেত্রে মানবহিতকে এই কর্মযোগের সঙ্গে জড়িত করে তিনি মন্তব্য করেছেন যে, যখন কারও কোনো কর্মানুষ্ঠান নিজের স্বার্থের পরিধি অতিক্রম করে সার্বিক স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন তার মধ্যে নিজ কামনা অন্যতম রূপে অন্তর্ভুক্ত থাকলেও তাকে নিষ্কাম কর্মানুষ্ঠান নামে অভিহিত করতে পারি। এই ভাবে নিষ্কামতাকে বঙ্কিম অনেকটা বাস্তবতার মধ্যে দিয়ে ব্যাখ্যা করে প্রাচীন শাস্ত্রের প্রয়োগ ও পাশ্চাত্য হিতবাদের প্রতিষ্ঠা উভয়ই একসঙ্গে সাধিত করেছেন। পাশ্চাত্য চিন্তাগুলিকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ধর্মীয় দিক থেকে যথেষ্ট আত্মস্থ করা এ ভাবেই সম্ভব হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিবেকানন্দের ধর্মচিন্তার আবির্ভাব। তার মধ্যেও সেই সমন্বয়ের রূপ পরিলক্ষিত হয়। বস্তুতঃ বিবৃত ধর্মচিন্তাগুলির মধ্যে দিয়েই ব্যক্তিত্ব চালিত হয়ে বিবেকানন্দের ধর্ম চিন্তা আবির্ভূত হয়েছে।

সামাজিক চিন্তা॥ পূর্বোক্ত স্থান, কাল ও পাত্র-চেতনা এবং এর সঙ্গে যুক্তিবাদ ধর্মচিন্তার মতো এই শতাব্দীর সমাজ চিন্তাকেও নিয়ন্ত্রিত করেছে। একদিক থেকে ধর্মীয় ইত্যাদি চিন্তাগুলিও সমাজ চিন্তার মধ্যেই পড়ে। কারণ ধর্মীয় চিন্তার অর্থ সাধারণতঃ ধর্মীয় প্রথা সম্পর্কিত চিন্তা। আমাদের ধর্ম সাধারণতঃ এদেশীয় সংস্কৃতি ভিত্তিক। তাই পৃথক ভাবে সমাজ চিন্তাকে নির্ধারণ করা সহজ নয়।

স্থান কাল এবং পাত্র-চেতনা, এবং এর সঙ্গে যুক্তিবাদ সমাজের

বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছে। আমাদের দেশের সমাজ পরিবার ভিত্তিক বলে দাম্পত্য তথা পারিবারিক ক্ষেত্রই এতে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছে। বিভিন্ন বৈবাহিক প্রথার বিরুদ্ধে তাই প্রগতিশীল দৃষ্টি সচেতন হয়ে উঠেছে। বিধবা বিবাহ নিষেধ, বাল্য বিবাহ প্রথা, অসমবিবাহ প্রথা, বহুবিবাহ প্রথা, কৌলীন্য প্রথা, সহমরণ প্রথা, বিবাহ বন্ধনে গোষ্ঠী সঙ্কীর্ণতা ইত্যাদি সম্পর্কে সমাজের রক্ষণশীলতা ক্রমে ক্রমে শিথিল হয়েছে বা নিবিষ্ট হয়েছে। দাম্পত্য ক্ষেত্র আমাদের দেশে গুরুত্ব পেয়েছে বলে অনেকেই সমাজ-চিন্তা বলতে প্রধানতঃ এ গুলিকেই বুঝে থাকেন। দাম্পত্য জীবনকে ক্ষতিগ্রস্ত করে, এমন অনেক অনাচার যেমন মদ্যপান, লাম্পট্য, বেশ্যাগমন ইত্যাদি সম্পর্কে চিন্তাও সেযুগে প্রাধান্য লাভ করেছিলো। পূর্বোক্ত প্রগতিশীল চিন্তাগুলি রাজ-আনুকুল্যের আশ্রয়ে প্রকাশ পেতে শুরু করে। শেষোক্ত চিন্তাগুলি রক্ষণশীল গোষ্ঠীর আক্রমণার্থ অস্ত্র স্বরূপ গণ্য হয়েছে এবং পরে এই অস্ত্র সমূহ উভয় গোষ্ঠীই আক্রমণার্থে ব্যবহার করেছেন। এই সমস্ত সমাজ চিন্তা প্রকাশ পেয়েছে বিভিন্ন সভাসমিতির প্রস্তাব বা পঠিত প্রবন্ধে, শাসকের কাছে প্রেরিত বিভিন্ন দরখাস্তে, বিভিন্ন উদ্দেশ্য মূলক সাহিত্য রচনায়—বিশেষ করে সামাজিক প্রহসনগুলিতে। সামাজিক নাটক, উপন্যাস, গল্প কিংবা সমাজ প্রবন্ধগুলির মধ্যেও এই সব চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। অনেকে সমাজ চিন্তার চাপে পড়ে সাহিত্যকে জলাঞ্জলি দিতে ইতস্ততঃ বোধ করেন নি। রামমোহন, ভবানীচরণ, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর, রাধাকান্ত দেব, ভূদেব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উনবিংশ শতাব্দীর বহু ব্যক্তি সমাজের বিভিন্ন প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল আন্দোলনে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে সংযুক্ত ছিলেন।

আর্থিক দিক থেকেও যুক্তিবাদ এবং স্থান-কাল-পাত্র চেতনা এসে সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। পণপ্রথা,

বিলাসিতা, অপরিমিত ব্যয়, দুর্নৈতিক ব্যয়, দুর্নৈতিক আয়—ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল এবং রক্ষণশীল উভয় পক্ষ থেকেই দৃষ্টিকোণের জন্ম হয়েছে। সমাজে বিধবা সমস্যা, আর্থিক সমস্যা, সহমরণ প্রথাও প্রকারান্তরে আত্মীয় স্বজনের আর্থিক প্রলোভন! সুতরাং এই জাতীয় আন্দোলনের মধ্যেও আর্থিক দিক জড়িত ছিলো। নারীজাতি যাতে সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হন, তার জন্যে রামমোহনের সময় থেকে আন্দোলনের জন্ম হয়। বিদ্যাসাগর সূচিত হিন্দু ফ্যামিলি অ্যানুয়িটি ফাণ্ড্ প্রগতিশীল পদক্ষেপেরই একটি সার্থকতা বিশেষ।

যৌন বা আর্থিক দিকের মতো সাংস্কৃতিক দিক থেকেও যুক্তিবাদ এবং স্থান-কাল-পাত্র চেতনা এসে সামাজিক প্রথার বিরুদ্ধে সমর্থনপুষ্ট দৃষ্টিকোণ সৃষ্টি করেছে। ধর্মের নামে আচার সর্বস্বতা, ধর্মধ্বজ ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মাচরণের অভাব, ধর্মকে ব্যবসায় রূপে দেখার চেষ্টা ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ সূচিত হয়েছে, তেমনি সভ্যতার নামে আদবকায়দা-সর্বস্বতা ও বিলাসিতা, সভ্যতার নামে চারিত্রিক দুর্নীতি—যৌন ও আর্থিক ক্ষেত্রে—ইত্যাদিও রক্ষণশীল গোষ্ঠীর চিন্তাধারাকে আন্দোলিত করেছে। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীস্বাধীনতা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের একটি উল্লেখযোগ্য আন্দোলন। পরিবার কেন্দ্রিক ক্ষেত্রে এই দিকটি প্রগতিশীল ও রক্ষণশীল—উভয় গোষ্ঠীকেই সক্রিয় করেছে। সাংস্কৃতিক চিন্তাকে বলিষ্ঠ করবার জন্যে আমাদের উত্তেজক ক্ষেত্র অর্থাৎ পারিবারিক ক্ষেত্রকে অনেক ক্ষেত্রেই এর সঙ্গে জড়িত করা হয়েছে।

জাত পাঁত সংস্কৃতি, সাহিত্য শিল্প আমোদ প্রমোদ ইত্যাদি বিষয়েও সমাজ চিন্তা গৌণ স্থান অধিকার করে নি। বিশেষ করে নতুন সমাজ ব্যবস্থায় পুরোনো প্রতিষ্ঠিত গোষ্ঠীর আর্থিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে হীনতায় প্রসূত ক্ষোভ রক্ষণশীলের পক্ষ থেকে জাতপাঁত সম্পর্কিত বিভিন্ন আক্রমণাত্মক উক্তি বর্ষণে সহায়তা করেছে।

জাতপাঁতের ধর্মীয় উদ্দেশ্য প্রচার করে, নীচু জাতের আভিজাত্য অর্জনের ব্যর্থ চেষ্টা চিত্রিত করে রক্ষণশীলরা তাঁদের স্বার্থরক্ষায় অগ্রসর হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, জাতপাঁত সম্পর্কিত সামাজিক বন্ধনগুলি নতুন সমাজ ব্যবস্থায় যখন আপনা থেকেই শিথিল হয়েছে, তখন প্রগতিশীল দৃষ্টি নতুন সমাজ ব্যবস্থাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। পাত্র চেতনা তথা মানবত্বের মর্যাদাবোধ এই তথাকথিত সামাজিক তথা ধর্মীয় আচারের বিরুদ্ধে ঘৃণা প্রকাশ করেছে।

শিক্ষার আচারসর্বস্বতা, অধিকার-অনধিকার ভেদ, শিক্ষাক্ষেত্রের সঙ্কীর্ণতা শিক্ষার ব্যাবহারিকতা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রগতিশীল দৃষ্টিকোণ সমাজমানসকে প্রভাবিত করেছে। নতুন সমাজব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ইত্যাদির সঙ্গে শিক্ষার বিষয় ও পদ্ধতির পরিবর্তন সাধনের প্রয়োজন অনুভূত হয়েছে। তদনুসায়ী পাশ্চাত্য ভাষা ও বিজ্ঞান শিক্ষার যুক্তিযুক্ততা, প্রাচ্য গতানুগতিক পদ্ধতির পরিবর্তন ইত্যাদির চেষ্টায় সমাজের বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব সক্রিয় হয়েছে। রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রগতিশীল আন্দোলনকে পোষণ করে একই সঙ্গে শাসকগোষ্ঠী এবং প্রগতিশীল গোষ্ঠীর উদ্দেশ্য সাধিত করেছে প্রগতিশীলতায় এই রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য সমাজকে করেছে গতিশীল, এবং এই গতিশীলতায় কুসংস্কার ও প্রথার অনেক ক্লেদ ধুয়ে গেছে।

বিবেকানন্দের সাধনা পলায়নপন্থী ধর্মসাধনা নয়। সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে এই চেতনার ছিলো ঘনিষ্ঠ সংযোগ। তাই বিবেকচিন্তার পটভূমিকা-স্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর সমাজ-চিন্তার গুরুত্ব যথেষ্ট।

রাষ্ট্রীয় চিন্তা॥ ধর্মীয় এবং সামাজিক চিন্তার মতো রাষ্ট্রীয় চিন্তার ক্ষেত্রেও যুক্তিবাদ এবং স্থান কাল-পাত্র চেতনার প্রভাব বিদ্যমান্। উনবিংশ শতাব্দীতে রামমোহনেই তার সূচনা দেখা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিক পর্যন্ত আমেরিকা ইউরোপের ইতিহাস ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধে স্পষ্ট।

আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রাম, ফ্রান্সে গণবিপ্লব, ইংলণ্ডে শ্রমিক অভ্যুত্থান ইত্যাদির অন্তর্নিহিত একটি সাধারণ শক্তির ক্রিয়া রামমোহন আগ্রহের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন এবং উপলব্ধি করেছেন। জগতের যে কোনো প্রগতিশীল ক্রিয়াকলাপে তাঁর চাঞ্চল্য সর্বজন-বিদিত।

রামমোহন ইংরেজী শিক্ষাকে সমর্থন করলেও ইংরেজ শাসনের ত্রুটিগুলি সহ্য করতে পারেন নি। ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ কিংবা ১৮২৮ খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেশন আইন ইত্যাদির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র প্রতিবাদ স্মরণীয়। স্বদেশের প্রগতি-শীলতার জন্যে ইংরেজের সহায়তা যেক্ষেত্রে এবং যেটুকু অপরিহার্য, রামমোহন শুধু সেটুকুই মানতে পেরেছেন। অন্যান্য স্বাধীনতার মতো তাঁর রাষ্ট্রনৈতিক স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষার কথা বিপিনচন্দ্র পালের মন্তব্যেই প্রকাশ পাবে,—"Swaraj, even in the limited sense of complete political independence, was present in the mind of Raja Rammohan Roy" রামমোহনের পরে Hindu College-এর (১৮১৭ খ্রীঃ) ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর রাষ্ট্রনৈতিক চেতনা উল্লেখযোগ্য। ডিরোজিওর এই ছাত্রগোষ্ঠী সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে যেমন গণতান্ত্রিক স্বাধিকারবোধ প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন, রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকেও সেই স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা বা পদক্ষেপ অস্পষ্ট নয়। ব্ল্যাক অ্যাক্টের বিরুদ্ধে রামগোপাল ঘোষের নেতৃত্বে সক্রিয়তা স্মরণীয়। ইয়ং বেঙ্গল প্রতিষ্ঠিত 'সোসাইটি ফর দি অ্যাকুইজেশান্ অব্ জেনারেল নলেজ' (১৮৩৮ খ্রীঃ) রাজনীতি চর্চাকেও অন্যতম উদ্দেশ্যরূপে গ্রহণ করেছে। রাজনীতি ও অর্থনীতি নিয়ে ইয়ংবেঙ্গলের চিন্তা ক্রমে আরও প্রাধান্য লাভ করেছে। 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর'-এর জন্ম (১৮৪২) এবং 'বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটি'র প্রতিষ্ঠা (১৮৪৩) এ সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য।

১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান ইয়ংবেঙ্গলের হাত থেকে রাজনীতিচর্চার দায়িত্ব গ্রহণ করে। এই সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজ ইংরেজ শাসনের পীড়ন সম্পর্কে অনেকটা সচেতন হলেও তাঁরা শাসনের উচ্ছেদ চান নি; ইংরেজকে অনুরোধের মাধ্যমে পীড়নের লাঘবই তাঁদের কাম্য ছিলো। এই সময়ে বিভিন্ন স্বদেশপ্রেম-যুক্ত সাহিত্যের ব্যাপক সৃষ্টি ঘটে। তার মধ্যে অবশ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে পন্থার উগ্রতাও লক্ষ্য করা যায়।

হিন্দুমেলার মধ্যে দিয়ে স্বাদেশিকতার নতুন জোয়ার আসে। 'হিন্দুমেলা' বা 'চৈত্রমেলা'র (সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কথিত 'স্বদেশী মেলা') উদ্বোধন ১২৭৩ সালের চৈত্র সংক্রান্তির দিনে বেলগাছিয়ার ডনকিন সাহেবের বাগানে হয়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার আঠারো বছর আগে বাঙালী এই মেলা অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে সর্বভারতীয় ঐক্য সংস্থাপনের চেষ্টা করে। স্বদেশী শিল্পের পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টা এবং স্বদেশী সঙ্গীতের মাধ্যমে দেশবাসীর অন্তরে দেশপ্রেমের আবেগ সঞ্চার এই মেলার বিশেষত্ব। জাতীয়তাবোধ এ সময়ে দেশবাসীকে কতোখানি উন্নত করেছে, তার একটি নিদর্শন "ন্যাশন্যাল নবগোপাল।"

এ সময়ে ইংরেজশাসনের উচ্ছেদ কামনা অনেক স্পষ্ট হয়েছে। ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দের ১১ই মার্চে বেথুন সোসাইটির একটি সভায় তারাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় প্রকাশ্যে ব্যক্ত করলেন,—"যতোদিন পর্যন্ত ইংরেজরা ভ্রাতৃভাবে ভারতবর্ষ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশ গমন না করিবেন ততদিন আমাদিগের মন প্রকৃত স্বাধীনতা অবলম্বন করিতে পারিবে না ও আমাদিগের স্থায়ী ও প্রকৃত মঙ্গল হইবে না।" হিন্দুমেলার মধ্যে স্বদেশপ্রেম থাকলেও ইংরেজ বিদ্বেষ বা শাসক বিদ্বেষ তেমন প্রকট ছিলো না। এই সময়ে কয়েকটি পত্রিকা রাজনৈতিক আন্দোলনে সক্রিয় হয়। তার মধ্যে অমৃতবাজার

পত্রিকার কথা প্রথমে স্মরণীয়। অমৃতবাজারে ইংরেজদের কুশাসন ও আমাদের কর্তব্য সম্বন্ধে অনেকখানি স্পষ্টবাদিতা লক্ষ্য করি। মাসিক 'বঙ্গদর্শন' (১২৭৯) এবং সাপ্তাহিক 'সাধারণীর' কথাও এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। আত্মশক্তির ওপর দেশবাসীর নির্ভরতা, বিদেশী শোষণ-যন্ত্রের স্বরূপ বিশ্লেষণ ; পাশ্চাত্য অনুকরণের প্রতি বিরূপতা, বিদেশী বর্জনের পূর্বাভাস, ইংরেজদের সঙ্গে সম্পর্ক রক্ষায় আত্মমর্যাদাবোধ ইত্যাদি বিভিন্ন দিক পত্র পত্রিকার মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পেয়েছে।

প্রগতিশীল ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে দিয়েও রাষ্ট্রচিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। সমাজ সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে 'ভারত সংস্কার সভার' সৃষ্টি হলেও রাজনীতি চর্চাও সমাজ চর্চার সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের (১৮৭৮ খৃঃ) নতুন কর্মকর্তারা রাজনীতি ও স্বাদেশিকতাকে অনেক প্রাধান্য দিয়েছেন। 'ব্রাহ্ম পাবলিক ওপিনিয়ন', 'তত্ত্ব কৌমুদী' ইত্যাদি যে সব পত্রিকা এঁদের পক্ষ থেকে প্রচারিত হয়েছে, সেগুলির বিষয়বস্তুতেই তা পরিলক্ষিত হয়।

এই সময়কার সমাজব্যক্তিত্ব কর্তৃক "ইণ্ডিয়ান্ লীগ" (১৮৭৫ খৃঃ) 'ষ্টুডেন্টস্ অ্যাসোসিয়েশন' ইত্যাদি বিভিন্ন সভা সংস্থা গড়ে ওঠে এবং এগুলির মধ্যে দিয়ে রাজনীতি চর্চা যথেষ্ট হয়। আত্মশক্তির উদ্বোধন এবং ইংরেজ শাসনের প্রতি বিদ্বেষ সংস্থাপকদের চিন্তায় প্রাধান্য লাভ করে।

ইতিমধ্যে ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশান্ বা ভারতসভা সর্বভারতীয় ঐক্য সৃষ্টি এবং গণসংযোগের জন্যে পদক্ষেপ করেছে। বিশেষ করে গণসংযোগের উদ্দেশ্যেই 'রায়ত সভার' সৃষ্টি। তবে শিক্ষিত মধ্য-বিত্তের প্রাধান্যদানে আন্দোলনে কিছু ভ্রমাত্মকতা আসে। এই সময়ে ইল্‌বার্ট বিল্ আন্দোলন (১৮৮৩ খৃঃ) ঘটে। দেশীয় বিচারক দ্বারা ইংরেজ আসামীর বিচারের প্রস্তাবকে ইংরেজদের বিরোধিতা সত্ত্বেও ভারতসভার সভ্যরা সমর্থন করে আন্দোলন করে এবং ব্যর্থ হয়। এই

ব্যর্থতার কারণ অনুসন্ধান করে স্বাদেশিকরা সংগঠনের অভাব লক্ষ্য করেন। সংগঠন সৃষ্টির উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে 'ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্স' আহ্বান করা হয়। ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দেও আবার এই কন্‌ফারেন্স আহূত হয়। তবে এবছরে হিউমের নেতৃত্বে কংগ্রেসের সৃষ্টিতে ন্যাশন্যাল কন্‌ফারেন্সের প্রয়োজন শেষ হয়।

কংগ্রেসের প্রাথমিক পর্বের চিন্তা ছিলো শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের সমস্যা নিয়ে। সরকারী চাকরীর নানা ক্ষেত্রে অধিকার আদায়, ইংরেজদের সঙ্গে দেশ শাসনে অংশ গ্রহণের সুযোগ, সামরিক খাতে ব্যয় সংকোচের দাবী, দেশে শিক্ষাবিস্তার ইত্যাদির মধ্যে কংগ্রেসের চিন্তা সীমিত ছিলো।

কিন্তু সাধারণ অশিক্ষিত শ্রমিক ও কৃষক সমাজ এঁদের চিন্তায় ছিলো অপাঙক্তেয়। তাই কংগ্রেসী আন্দোলনের বিরুদ্ধে কিছু স্বাদেশিকের ক্ষোভ প্রকাশ পায়। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার সময় থেকে উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার দ্রুত পতন দেখা যায়। এই সময়ে দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর প্রাদুর্ভাব দেখা যায় ঘন ঘন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০১ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে আঠারো বার দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। দশ বছরের দুর্ভিক্ষে নাকি দু-কোটি লোকের প্রাণনাশ ঘটে। অথচ এই সময়েই সামরিক খাতে ইংরেজদের প্রচুর ব্যয় (সমকালীন বিভিন্ন সামরিক অভিযানের জন্যে) ঘটে এবং তার অনেকটাই যোগান দিয়েছে এদেশীয় প্রজাপুঞ্জ। মদ বা অন্যান্য মাদক দ্রব্য প্রচলনে ইংরেজ শাসকদের আনুকূল্যের মূলে তাদের অর্থগৃধ্নুতা এবং বোধহীনতা সৃষ্টির চক্রান্ত আবিষ্কার করা কঠিন হয় না।

বিভিন্ন কারণে তাই এযুগে কংগ্রেসের আবেদনমূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে অসন্তোষ শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যে প্রাধান্য লাভ করে। এই অবস্থার প্রতিকারের জন্যে জাতীয় শিক্ষা, জাতীয় শিল্পবাণিজ্য ইত্যাদির গুরুত্ব তাঁরা উপলব্ধি করলেন। আর উপলব্ধি করলেন

এদেশীয় ইতিহাসকে ইংরেজ স্বার্থ থেকে মুক্ত করে জাতীয়তার সিঞ্চনে স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠা করা দরকার।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের আগে এদেশীয় রাষ্ট্রীয় চিন্তা এইভাবেই অগ্রসর হয়েছে। স্বামী বিবেকানন্দের রাষ্ট্রীয় চিন্তা সমকালীন আবহাওয়া থেকে নিঃশ্বাস গ্রহণ করেছে। সুতরাং বিবেকচিন্তার পটভূমিকায় ধর্মীয় ও সামাজিক চিন্তার মতো উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় চিন্তার গুরুত্ব যথেষ্ট।

৮

সমকালীন চিন্তার পটভূমিকায় বিবেক-চিন্তা

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় নবজাগরণের ফলে যে স্থান-কাল-পাত্র চেতনা ও যুক্তিবোধের জন্ম হয়, তা ধর্মীয় রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ চিন্তার ক্ষেত্রে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বকে প্রভাবিত করে। বলা বাহুল্য, বিবেকানন্দের ব্যক্তিত্ব উনবিংশ শতাব্দীর সেই সাধারণ ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন নয়।

ধর্মের উদ্দেশ্য আত্মার বিকাশ সংঘটন। আত্মার সর্বভূতে ব্যাপ্তির মধ্যে এবং আত্মার পাশবক্ষেত্র থেকে মানবধর্মের মাধ্যমে দেবত্বে সমুন্নতির মধ্যে। আচার এই ধর্মের উদ্দেশ্য সাধনে সহায়তা করে মাত্র। প্রাগাধুনিক ধর্মদৃষ্টিতে আচারের প্রাধান্য, এবং ধর্মের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে আত্মার সমুন্নতির ক্ষেত্রটিকেই স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া ধর্মের মূল্যায়নে আচারের মূল্যায়ন স্বীকৃত হওয়ায় ধর্মের বস্তুগত দিকটি প্রাধান্য পায়। ফলে ধর্মের মধ্যে জেগেছে অধিকার অনধিকার বোধ, সম্প্রদায় উপসম্প্রদায়, প্রতিমা সর্বস্বতা ইত্যাদি। ধর্মীয় আচার সমাজ জীবনকেও করেছে প্রভাবিত এবং ফলে সামাজিক কুসংস্কার-গুলিও মূল্য পেয়েছে। রামমোহনের অদ্বৈতবাদ একই সঙ্গে এনেছে আত্মার সমুন্নতি এবং ঐশ্বরিক যোগসূত্রে আত্মার ব্যাপ্তি। রামমোহনের ধর্মচেতনার মধ্যেই জড়িয়ে আছে মানবাত্মার মহিমা বোধ। বিবেকানন্দের মধ্যে আছে এই মানবাত্মার মহিমাবোধেরই ক্রমবিকাশ। মানবাত্মার মহিমাবোধ থেকেই সমাজ, রাষ্ট্র, ধর্ম, শিক্ষা সংস্কৃতির সব কিছুর মধ্যে বাস্তব মানব সমাজের প্রয়োজনীয়তার দিকটি তিনি বিস্মৃত হন নি।

ধর্ম সচেতন ভারতবাসীর মনোধর্মের পরিবর্তন আধ্যাত্মিকতার মাধ্যমেই সম্ভব, বিবেকানন্দ তা উপলব্ধি করে আত্মার সমুন্নতির সঙ্গে আত্মার ব্যাপ্তির দিকটিকে মূল্য দেবার জন্যে মানবসেবাকে আধ্যাত্মিক ব্যঞ্জনায় প্রতিষ্ঠিত করলেন। বঙ্কিমচন্দ্র নিষ্কাম কর্মযোগের অবাস্তবতাকে বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে, আত্মকামনাকে সমষ্টি-কামনার সঙ্গে সংযুক্ত করতে বলেছেন। আত্মস্বার্থকে সমষ্টি স্বার্থে রূপান্তর করলে তাকেই নিষ্কাম অবস্থা বলা যায়। বঙ্কিমচন্দ্রের এই ব্যাপ্তিপ্রস্থাই বিবেকানন্দে 'জীব-শিব' তত্ত্ব। ব্যাপ্তির পথে প্রথমে সর্বজীবের সঙ্গে নিজের অভেদ কল্পনা, দ্বিতীয় স্তরে জীব ও জড়ের সঙ্গে নিজের অভেদ কল্পনা, তৃতীয় স্তরে সর্বভূতের সঙ্গে নিজের অভেদ কল্পনা, চতুর্থ স্তরে সর্বভূতের কেন্দ্রীয় শক্তির সঙ্গে নিজের অভেদ কল্পনা। রামকৃষ্ণ সমুন্নতির মধ্যে অসম্পূর্ণতা লক্ষ্য করে আরোহ অবরোহ উভয়কেই স্বীকার করেছেন। তিনি বলেছেন—"তাঁকে সর্বভূতে দেখতে লাগলুম।·· দশভুজা, ষড়ভুজা, চতুর্ভুজা, দ্বিভুজা, আরো ছোট করে এক খণ্ড নুড়িতে ঈশ্বরকে এনে ফেলেছি—শালগ্রাম শিলা। তার পরে সমস্ত প্রতীকের বাইরে চলে গিয়েছি। সাকার ভূমি থেকে নিরাকারে চলে গেছি। কিন্তু তুমি কি ভেবেছ নিরাকার থেকে আবার সাকারে ফিরে এসেছি। প্রত্যেক মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের মুখচ্ছবি প্রত্যক্ষ করেছি। নরাকারে নিরাকার।" রামকৃষ্ণের শেষোক্ত উক্তিই ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মকে স্বীকৃতি দিয়েছে। এবং, বিবেক চিন্তাও তার অনুবর্তী। তাই তিনি মন্তব্য করেছেন,—

"ব্রহ্মা হতে কীট-পরমাণু, সর্বভূতে সেই প্রেমময়
মনপ্রাণ শরীর অর্পণ, কর সখে, এ সবার পায়।
বহুরূপে সম্মুখে তোমার, ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর।
জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর॥"

সমুন্নতি-সর্বস্ব ধর্মীয় চেতনাকে দূরে সরিয়ে রেখে নব আন্দোলনে

শক্তিসৃষ্টিতে ব্যাপ্তিকেই তিনি একমাত্র স্বীকার করলেন এবং বললেন —"আমি মুক্তি চাই না, ভক্তি চাই না। আমি লাখ নরকে যাব··· বসন্তের ন্যায় লোকের কল্যাণ আচরণ করা, এই আমার ধর্ম।" এ যেন বিদ্যাসাগরের চিন্তারই সুন্দরতম প্রকাশ। বঙ্কিমচন্দ্র স্বার্থপরতাকে দুঃখাবহ এবং পরোপকারকে সুখের মূল বলেছেন। বিবেকানন্দ সুখ ও দুঃখকে জীবন ও মৃত্যু এই নামান্তর দিয়ে ঘোষণা করেছেন— "পরোপকারই জীবন, পরহিত চেষ্টার অভাবই মৃত্যু।"

ধর্মকে objective ভাবে দেখবার প্রাচীন রীতির বিরুদ্ধে উনবিংশ শতাব্দীতে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। বিবেকানন্দ স্পষ্টভাবে ঘোষণা করলেন—"Religion is neither word nor doctrine. It is to be and become, not to hear and accept. It is the whole soul changed into that which it believes." মানুষ তার ধর্মকে subjective ভাবে গ্রহণ করলে আকারগত বিভেদের কোনো মূল্য থাকে না। রামকৃষ্ণ বলেছেন—"যতো মত তত পথ। কিন্তু পথটাই পৌঁছনো নয়। যদি ভুল পথেও যাও ঘুর-পথেও যাও, অন্তরে যদি অসরল না থাকে, তবে সে পথও একদিন সোজা পথ হয়ে যাবে।" আচার তথা ধর্ম সম্পর্কে বস্তুগত দিকগুলি সম্পর্কে এই উদাসীনতা বিবেকানন্দের মধ্যে জাগ্রত ছিলো।

ধর্মে অদ্বৈতবাদ প্রয়োগ উনবিংশ শতাব্দীর ধর্মচিন্তায় পরিলক্ষিত হয়। অদ্বৈতবাদকে জীবনে এবং সাংসারিক নীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ যে অসম্ভব নয়, তা রামমোহন প্রথমে উপলব্ধি করেছেন। সেই উপলব্ধির সূত্র ধরেই বিবেকানন্দের চিন্তায় দেখি, তিনি নীতিতত্ত্বকে অদ্বৈতবাদ দিয়ে ব্যাখা করেছেন। সব নীতিতত্ত্বের সার—অন্যের মঙ্গলসাধন। অদ্বৈতবাদ থেকেই শিক্ষা—অপরকে হিংসা করা অর্থ নিজেকেই হিংসা করা, কারণ অপরে এবং নিজে অভেদ। ঈশ্বরের

মর্যাদা দিতে হলে কিংবা ঈশ্বরে বিশ্বাস আনতে হলে নিজেকে মর্যাদা দিতে হয়, নিজের ওপরে বিশ্বাস আনতে হয়। আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে অপরিহার্য। সুতরাং আমাদের দেশে বর্তমান অবস্থায় অদ্বৈতবাদ প্রয়োগের প্রয়োজন বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছেন। এই Practical Vedanta ব্যাপ্তি ও সমুন্নতি উভয় দিককেই মূল্য দিয়েছে।

বিবেকানন্দ প্রগতিশীলতা ব্যতিরিক্ত ধর্মকে পছন্দ করতেন না। তাই অনেকক্ষেত্রে তথাকথিত ধর্মকে ত্যাগ করেও প্রগতিশীলতাকে গ্রহণ করতে বলেছেন। যৌবন ও গতির ধর্ম এই যে, ক্লেদ ও আবর্জনাকে তা দূর করে দেয়। সুতরাং যৌবন-ধর্ম ও গতিধর্মকে স্বীকার করলে তার মাধ্যমেই প্রকৃত ধর্মকেই স্বীকার করা যায়। তিনি বলেছেন—"তোমরা সব ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দাও, এমন কি নিজেদের মুক্তি পর্যন্ত দূরে ফেলিয়া দাও—যাও, অপরের সাহায্য কর। তোমরা সর্বদা বড় বড় কথা কহিতেছ—কিন্তু এই তোমাদের সম্মুখে কর্মে পরিণত বেদান্ত স্থাপন করিলাম।...আমাদের আবশ্যক শক্তি, শক্তি, কেবল শক্তি। আর উপনিষৎ সমূহ বৃহৎ আকর স্বরূপ।...মুক্তি বা স্বাধীনতা দৈহিক স্বাধীনতা, মানসিক স্বাধীনতা, আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা, ইহাই উপনিষদের মূলমন্ত্র।...হে আমার যুবক বন্ধুগণ, তোমরা সবল হও—ইহাই তোমাদের প্রতি আমার উপদেশ। গীতা পাঠ অপেক্ষা ফুটবল খেলিলে তোমরা স্বর্গের অধিকতর সমীপবর্তী হইবে।" (ভারত আত্মার বাণী—জগদীশচন্দ্র ঘোষ)। যুব সম্প্রদায় তাদের যুবধর্মকে স্বীকার করেই প্রকৃত ধর্মকে স্বীকার করবে, এই ছিলো তার আশা। তিনি বলেছেন—"আমি বরং তোমাদের প্রত্যেককে ঘোর নাস্তিক দেখিতে ইচ্ছা করি। কিন্তু কুসংস্কারগ্রস্ত নির্বোধ দেখিতে ইচ্ছা করি না; কারণ নাস্তিকের বরং জীবন আছে, তাহার কিছু হইবার আশা আছে, সে মৃত নহে। কিন্তু

যদি কুসংস্কার ঢোকে, তবে মাথা একেবারে যায়, মস্তিষ্ক নির্বীর্য হইয়া যায়।...আমরা চাই রক্ত তাজা হউক, স্নায়ু সতেজ হউক পেশী লৌহদৃঢ় হউক।" (ঐ)। শেষোক্ত উক্তিগুলির মধ্যে ডিরোজিও-রিচার্ডসান যুগের মানসিকতাকেই পর্যবেক্ষণ করি।

বিবেকানন্দ এদেশীয় শাস্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়ে দেশীয় ঐতিহ্যকে যেমন ভিত্তিস্বরূপ স্বীকার করেছেন, তেমনি দেশবিদেশ পরিভ্রমণ করে তিনি বর্তমান কালের উপযোগী করে জাতীয় আদর্শকে উপস্থাপন করবার প্রেরণা পেয়েছেন। প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য —সবকিছু থেকে শ্রেষ্ঠ সম্পদ আহরণ করে তিনি বর্তমান ভারতকে সোনার দেশ করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

৯

চিন্তাধারা—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য

প্রাচ্য জগৎ এবং পাশ্চাত্য জগতের ধর্মীয়, সামাজিক, রাষ্ট্রীয়, সাংস্কৃতিক, পারিবারিক ইত্যাদি বিভিন্ন দিকের পরিচয় প্রদান প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ গ্রন্থটিতে উক্ত দুই জগতের মধ্যে তুলনা করে প্রাচ্য জগতের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করেছেন। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে তিনি প্রাচ্য বিভিন্ন দিকের সমালোচনা করেছেন, কিন্তু পাশ্চাত্য জগতের সমালোচনার তুলনায় সে সমালোচনা ততো তীব্র নয়। সুতরাং এই তুলনায় দেশীয় সংস্কৃতির প্রতি মাত্রাতীত শ্রদ্ধাবোধ বিচারের ক্ষেত্রে পক্ষপাতের সৃষ্টি করেছে বলে অনেক আধুনিক সমালোচক মনে করেন।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মূল বৈশিষ্ট্য বিবেকানন্দ উপলব্ধি করেছেন বটে, কিন্তু তুলনার বিষয়ে ক্ষেত্র-পরম্পরা সম্পর্কে তাঁর অভিনিবেশের কিছু অভাব থাকায় সামগ্রিক ভাবে তুলনামূলক প্রবন্ধ হতে পারেনি। অনেকক্ষেত্রে তিনি ইতিহাস, আচার-বিচার ইত্যাদির বর্ণনায় অনেকটা অসচেতন হয়ে পড়েছেন। ফলে প্রাবন্ধিকের মূল বক্তব্য হারিয়ে গেছে। সমকালীন প্রচলিত কিছু ঐতিহাসিক ও অন্যান্য তথ্যকে তিনি ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করায় আধুনিক দৃষ্টিতে তাঁর প্রদত্ত অনেক তথ্যকে ভ্রমাত্মক ও বৈতর্কিক বলে মনে হতে পারে। বিবেকানন্দ সামাজিক ও অন্যান্য আচার-বিচার বিভিন্ন বিদেশ ভ্রমণে থেকে লাভ করেছেন। তেমনি ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের

আচার বিচার ভারত ভ্রমণ থেকেই তিনি লাভ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন পূর্ব ও পশ্চিমকে একটি মৌলিক পার্থক্যের ভিত্তির ওপরে প্রদত্ত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত সমর্থক আচার-বিচার প্রদর্শনের মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন, বিবেকানন্দে তা অনুপস্থিত। আবার বিবেকানন্দের আলোচনার মধ্যে যে বৈঠকী ভাবটা দেখা যায়, রবীন্দ্রনাথে তা অনুপস্থিত। কিছু বিক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটি আদ্যন্ত পাঠ করলে দুই জগতের মোটামুটি পরিচয় একদিকে যেমন পাওয়া যায়, তেমনি দুই জগতের মূল দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্যটুকুও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সুতরাং সামগ্রিক বিচারে প্রাবন্ধিকের মূল উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়েছে বলা চলে।

বিবেকানন্দ প্রবন্ধের সূচনায় ভারতবর্ষে দারিদ্র্য এবং ঐশ্বর্যের সহাবস্থান ইঙ্গিত করেছেন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের তুলনা দিতে গিয়ে তিনি সূচনাতেই উভয় দেশের দৃষ্টিতে অপরের স্বরূপকে ব্যক্ত করেছেন। পাশ্চাত্য দৃষ্টিতে ভারতে ভিখারী ও যোগীর সহাবস্থান। প্রাচ্য দৃষ্টিতে পাশ্চাত্য জগৎ হিংসাবাদী, কামপরায়ণ, সুরাপায়ী, আচারহীন, জড়বাদী, পরদেশলুণ্ঠনজীবী এবং ইহকাল-সর্বস্ব। আমরা উভয়েই উভয়কে বহির্দৃষ্টিতে দেখি। এর পরিবর্তন প্রয়োজন।

শত দারিদ্র্যের মধ্যেও ভারতের কোথায় যেন একটি শক্তি আছে। বলা বাহুল্য তা তার আধ্যাত্মিকতা। ধর্ম হচ্ছে ইহলোক পরলোকে সুখের তৃষ্ণা এবং মোক্ষ হচ্ছে সুখের বন্ধন থেকে মুক্তি। প্রাচীন ভারতবর্ষে দুইয়ের সামঞ্জস্য থাকলেও পরে তার লোপ হয়। শুধু একটি পন্থা অপূর্ণ। মানুষের প্রকৃতিগত বৈচিত্র্য, দেশ বিদেশে সংস্কৃতি ইত্যাদির বিভিন্নতা কোনো একটি বিশেষ পন্থার প্রয়োগকে অবাস্তব করে তুলেছে। অনেক ধর্মীয় আচারে এই প্রায়োগিক ভুল লক্ষ্য করা যায়।

বিবেকানন্দের মতে, প্রত্যেক জীব শক্তি প্রকাশের এক একটি

কেন্দ্র। এই শক্তি পূর্ব কর্মফলে সঞ্চিত। সেই শক্তির অপ্রকাশে জীবের অস্থিরতা। ততোক্ষণ ভোগ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। দুঃখভোগ বা কুকর্মের চেয়ে সুখভোগ বা সুকর্ম অবশ্যই ভালো। ভালো জিনিসটি মুক্তিকামের কাছে একরকম, ধর্মকামের কাছে এক-রকম। কর্মত্যাগের চেয়ে ভালো মন্দ মিশ্র কর্মের অনুষ্ঠান ভালো। সত্ত্ব রজঃ এবং তমোগুণ তিনপ্রকার বৈশিষ্ট্য-সম্পন্ন মানুষ গঠিত করে। বিবেকানন্দের মতে জৈন এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায় আমাদের মধ্যে তমো-গুণ সৃষ্টিতে সহায়তা করছে।

প্রাচ্য ব্যক্তি কৃষ্ণের আরাধনা করে এবং পাশ্চাত্য ব্যক্তি যীশুর ভজনা করে। কৃষ্ণের নির্দেশ কর্মানুষ্ঠানের অনুপ্রেরক এবং যীশুর নির্দেশ কর্মত্যাগের অনুপ্রেরক। কিন্তু ফলতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে ঠিক বিপরীত জিনিসই লক্ষ্য করা যায়। বুদ্ধ ও যীশুর মোক্ষমার্গ সামষ্টিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ সম্ভব নয়। ফলে আমাদের দেশে এবং পাশ্চাত্য দেশে ক্ষতি হয়েছে। শঙ্করাচার্য এবং রামানুজ ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ—এই চতুবর্গের সমন্বয়ের আদর্শ এনে দিয়েছেন। কিন্তু আমরা এই আদর্শ অনুসরণ করি না। বৌদ্ধ এবং বৈদিকদের উপেয় এক হলেও উপায় ভিন্ন। বৈদিকদের উপায় হচ্ছে জাতিধর্ম এবং স্বধর্মের স্বীকৃতি। এতেই নিহিত আছে সমাজ-কল্যাণ ও মুক্তির উপায়, আমাদের অধঃপতন-এর পরিত্যাগে।

প্রত্যেক জাতির বিশিষ্ট জাতীয় উদ্দেশ্য আছে। ফরাসীদের স্বাধীনতা চেতনা, ইংরেজদের ব্যবসাবুদ্ধি ও ন্যায়ভাগের মতো আমাদের জাতীয় উদ্দেশ্য পারমার্থিক স্বাধীনতা বা মুক্তি। রাজনীতি সমাজনীতি সব কিছুকেই আমাদের দেশে ধর্মভিত্তিক না করলে সবই পণ্ডশ্রম! পাশ্চাত্য দেশের যা কিছু বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করি না কেন, তা আমাদের বিশিষ্ট ছাঁচে ফেলে গ্রহণ করতে হবে। ভালো ও মন্দ দুই দেশেই আছে।

বিবেকানন্দের মতে এদেশীয় ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং ভারতের বহিঃস্থিত চীন, হূণ, দরদ্, পহ্লব, যবন, যশ্ ইত্যাদি আর্য জাতি। বিবেকানন্দের এই উক্তিটি আধুনিক সমালোচনায় বিতর্কমূলক। আর্যগোষ্ঠীর পরিধির সঙ্গে হিন্দুগোষ্ঠীর পরিধিকে বিজড়িত করায় কিছু অস্পষ্টতার সৃষ্টি হয়েছে।

আমরা আমাদের আচার-বিচারকে ধর্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত করি, ফলে আমাদের পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি আভ্যন্তরীণ, পোষাকী নয়; আবার এই ধর্মচেতনাই আমাদের মধ্যে নৈরাশ্যবাদ মানসিক আশাবাদকে যেমন বিনষ্ট করেছে, তেমনি আমাদের খাদ্য-গ্রহণের ক্ষেত্রে কিছু অনাচার আমাদের দৈহিক সুস্থতা নষ্ট করেছে। অবশ্য খাদ্যবিচারের ক্ষেত্রে প্রাচীন আদর্শ অনুসরণ করলে তা হিতকর। পরিচ্ছন্নতা, সুস্থতা এবং খাদ্যাখাদ্যের বিচারকালে বহিঃদৃষ্টি গ্রহণের ফলে প্রাবন্ধিকের বক্তব্যে কিছু স্বতোবিরোধিতা আধুনিক সমালোচকবর্গের দৃষ্টিতে ধরা পড়তে পারে। পরিচ্ছদের বর্ণনার ক্ষেত্রেও একই জিনিস লক্ষণীয়। আমরা অলঙ্কারকে প্রাধান্যই দিই, পাশ্চাত্য ব্যক্তি প্রাধান্য দেয় পোষাক পরিচ্ছদকে। তাদের দেশে রুচি এবং লজ্জাবোধের তারতম্য আছে। বলা বাহুল্য প্রাচ্য দেশেও তা বিদ্যমান।

পাশ্চাত্য ব্যক্তিদের ধর্ম শক্তি এবং আধা বামাচার রকমের। তাতে মাতৃভাব যথেষ্ট। আমাদের শক্তিপূজা ধর্মস্থান নির্ভর, কিন্তু ওদের শক্তিপূজা চরিত্র-স্বভাবের অন্তর্গত বলে তা সর্বসময়ের। রেনেশাঁসই পাশ্চাত্যদের মধ্যে উন্নত দৃষ্টিভঙ্গী আনতে সহায়তা করেছে। এই রেনেশাঁসই পুরুষদের মধ্যে এনেছে সাহস ও বীরত্ব।

বিবেকানন্দ পরিণামবাদ এবং বিবর্তনবাদকে একার্থক রূপে উপস্থাপন করেছেন। আমাদের অন্তর্মুখী গতি সবকিছুর মধ্যে

'এক'-কে উপলব্ধি করেছে। বিবেকানন্দের মতে Evolution Theory পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে প্রভাবিত করেছে। 'এক' কেমন করে 'বহু' হয়েছে তা তুর্বোধ্য, কিন্তু 'এক' কি কি আকৃতি ও প্রকৃতি গ্রহণ করেছে, বিজ্ঞান তারই সন্ধান দিচ্ছে।

মানুষ এবং তার সমাজ কি করে বর্তমান অবস্থায় এসে পৌঁছেছে, তার একটি বিবর্তনগত চিত্র দিতে দিয়ে বিবেকানন্দ যে তথ্য গ্রহণ করেছেন, আধুনিক দৃষ্টিতে তা বিতর্কমূলক এবং কিছুটা পক্ষপাতযুক্ত। সুর-অসুরের তত্ত্ব থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন ধর্মীয় সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অভ্যুত্থানের ফলশ্রুতি ব্যাখ্যা করে প্রাবন্ধিক তাঁর বক্তব্যের সমর্থন খুঁজেছেন। এই প্রসঙ্গে ইউরোপীয় সভ্যতার একটি সংজ্ঞা দিয়েছেন। ইউরোপীয় সভ্যতা নাতিশীতোষ্ণ পার্বত্য সমুদ্রতটময় প্রদেশের সর্বদা যুদ্ধপ্রিয় বলিষ্ঠ বিভিন্ন জাতির মিশ্রিত এক জাতির ক্রমাগত যুদ্ধ ও বাণিজ্যময় সভ্যতা। এই সভ্যতার উপায় তলোয়ার, সহায় বীরত্ব, উদ্দেশ্য ইহ-পারলৌকিক ভোগ।

অন্যদিকে আমাদের সভ্যতা শান্তিমুখী। আমাদের এই শান্তিপ্রিয় পরিবেশে চিন্তাশীলতা ও সভ্যতার অবকাশ বেশি। ভোগের চেয়ে ত্যাগকে প্রাধান্য, দেহের চেয়ে মনকে প্রাধান্য দেওয়া আমাদের রীতি। ক্ষাত্রধর্মের অবকাশ আছে, তবে তা ধর্ম ও ন্যায়নীতিকে রক্ষার জন্যে। বিবেকানন্দের সংজ্ঞায় আর্য-সভ্যতা হচ্ছে বিশাল নদনদীপূর্ণ উষ্ণপ্রধান সমতল ক্ষেত্রে বহু সভ্য অসভ্য মানুষের বর্ণাশ্রমাচার, এবং এর উদ্দেশ্য সংঘর্ষ-নিবারণ। ইউরোপীয়দের মতো সকলকে নষ্ট করে নয়, সকলকে মর্যাদা দিয়েই আমাদের সভ্যতা।

ইউরোপীয়দের লক্ষ্মীর কৃপালাভ তাদের অনেক উন্নতিবিরোধী উপাদান সত্ত্বেও পাশ্চাত্য জগৎকে উন্নীত করেছে, অন্যদিকে আমাদের দারিদ্র্য আমাদের অনেক উন্নতিসূচক উপাদান সত্ত্বেও আমাদের

উন্নতি এনে দিতে পারছে না। অর্থনৈতিক দিক থেকে এবং অন্যান্য বিভিন্ন দিক থেকে আমাদের আরও কর্মমুখী হওয়া উচিত। আমরা হয়েছি বাক্‌সর্বস্ব এবং পাশ্চাত্যদের অন্ধ অনুকরণ করে আমরা তার মধ্যে দিয়ে উন্নতির পরিমাপ করছি। এই দৃষ্টি আমাদের পরিবর্তন করা উচিত—স্বধর্ম, স্ব-সমাজ এবং স্বজাতির স্বার্থে।

১০

বিবেকানন্দের জীবন

উত্তর কলকাতার সিমুলিয়ার দত্তবংশ একদা যথেষ্ট প্রতিপত্তিশালী ছিলো। বিবেকানন্দের প্রপিতামহ রামমোহন দত্ত তদানীন্তনকালে খ্যাতিমান্ ঐশ্বর্যশালী ছিলেন। জীবিকায় তিনি ছিলেন সুপ্রীম কোর্টের ব্যবহারজীবী। রামমোহনের পুত্রের নাম দুর্গাচরণ। তাঁর মানসিকতা পৃথক ধরণের। তাঁর বিষয়লিপ্সা ও অর্থোপার্জনে প্রবৃত্তি ছিলো না। তিনি তাঁর আইন ব্যবসায়ের ফাঁকে ফাঁকে ধর্মসেবা ও সাধুসেবা করতেন। মাত্র পঁচিশ বছর বয়সে তিনি স্ত্রীপুত্রের সংসার ত্যাগ করে দেশত্যাগী হন, এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন তীর্থ উদাসীন ভাবে ভ্রমণ করেন। দুর্গাচরণের পরিত্যক্ত শিশুপুত্রটি বিবেকানন্দের পিতা বিশ্বনাথ। বিশ্বনাথ বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে হাইকোর্টের অ্যাটর্নী হন এবং খ্যাতিলাভ করেন। প্রভূত উপার্জন করে তিনি যথেষ্ট আড়ম্বরের সঙ্গে দিন যাপন করতেন। পিতা সন্ন্যাসী, এ কথা তিনি বিস্মৃত ছিলেন না, তাই সাধুসঙ্গ ভালবাসতেন। ধর্মের বিষয়ে তাঁর গোঁড়ামি ছিলো না। অথচ বিভিন্ন ধর্ম সম্পর্কে তাঁর আগ্রহ ছিলো। তিনি প্রসন্ন, উদার প্রকৃতির এবং দয়ালু ছিলেন। পিতার মতো তিনিও ভ্রমণ বিলাসী ছিলেন। বিশ্বনাথের এই গুণগুলো বিবেকানন্দের মধ্যেও ছিলো।

বিবেকানন্দের পিতা এই বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতা ভুবনেশ্বরী। তিনি রক্ষণশীল এবং আচারপন্থী ছিলেন। বুদ্ধিমতী, কার্যকুশলা,

সুন্দরী এবং ভক্তিপরায়ণা ছিলেন। হাসিমুখে বিরাট সংসারের কাজ করেও সূচীকর্মাদিতে মনোনিবেশ করতেন। নিয়মিত রামায়ণ মহাভারত পড়তেন। স্বামী ও পুত্রের কাছে বিভিন্ন জ্ঞানের কথা শুনতে তিনি ভালবাসতেন।

বিশ্বনাথ ও ভুবনেশ্বরীর চারটি কন্যা ছিলো। অল্প বয়সেই তাদের দুজনের মৃত্যু হয়। পুত্র অভাবে তিনি নিয়মিত শিবপূজা করতেন। শেষে ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দের ১২ই জানুয়ারী সূর্যোদয়ের ৬ মিনিট পূর্বে বিশ্ববিজয়ী বিবেকানন্দ ভূমিষ্ঠ হলেন। সেদিন পৌষ-সংক্রান্তি, মকরবাহিনী পূজার দিন।

সন্ন্যাসী পিতামহ দুর্গাচরণের সঙ্গে তাঁর আকৃতি এবং প্রকৃতি— দুদিক থেকেই কিছু সাদৃশ্য ছিলো। বালক নরেন্দ্রনাথ সাধুসন্ন্যাসীদের প্রতি আকর্ষণ অনুভব করতেন। ছোটোবেলায় মার কাছে রামায়ণ মহাভারত শুনতেন এবং রাম-সীতার প্রতি তার ভক্তি বৃদ্ধি হয়। পরে অবশ্য শিবভক্তি তাঁর অন্তরে প্রাধান্য লাভ করেছিলো। ধর্মীয় চিন্তায় এক একসময় তিনি তন্ময় হয়ে যেতেন। সাধারণ ভাবে তিনি অত্যন্ত কৌতুকপ্রিয় ছিলেন এবং জীবজন্তুদের খুব ভালোবাসতেন। এ সময়ে তাঁর একটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেতো যে, সব ঘটনার পেছনে কারণ অনুসন্ধান না করে তিনি তৃপ্তি পেতেন না।

পাঁচ বছর বয়সে নরেন্দ্রনাথের বিদ্যারম্ভ হয়। এ সময়ে দুরন্ত বালকটিকে বশ করতে গুরুমশায় সাধাসাধি করতে বাধ্য হতেন। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে নরেন্দ্রনাথ মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউশনে ভর্তি হন। সেখানে তিনি একটি ক্ষুদ্রবাহিনীর দলপতি রূপে আবির্ভূত হলেন। এ সময়ে তার যুক্তিবোধ, শ্রুতিশক্তি ইত্যাদি বিশি ভাবে লক্ষিত হয়। নরেন্দ্রনাথের বয়স যখন চৌদ্দ, তখন পিতা কর্মস্থল মধ্য প্রদেশের রায়পুরে স্বাস্থ্যোদ্ধারে যান। এলাহাবা ও জব্বলপুর হয়ে নাগপুরে পৌছে দিন-পনেরো গরুর গাড়ীতে গি

তবে রায়পুরে পৌঁছোতে হয়। এর মধ্যে দিয়ে তাঁর ভ্রমণের ইচ্ছা অনেকটা পূর্ণ হয়। রায়পুরে স্কুল ছিলো না। পিতা নিজেই তাঁকে শিক্ষা দিতেন। দর্শন ও সাহিত্যালোচনায় অংশগ্রহণে তাঁকে আহ্বান করতেন। এ সময়ে তিনি নিয়মিত ব্যায়াম চর্চা করতেন এবং সুগঠিত স্বাস্থ্য নিয়ে কলকাতায় আসেন। কৃতিত্বের সঙ্গে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলেন। বাল্যকালে ইংরিজীর প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা থাকলেও পরে এ ভাষায় তাঁর দক্ষতা বিস্ময় উৎপাদন করে। এ সময়ে তাঁর সহৃদয়তা, তেজস্বিতা, বন্ধুবাৎসল্য, পরিহাস-রসিকতা, মেধা, চিন্তাশীলতা, ক্রীড়াপ্রিয়তা, ধর্মীয় উদারতা এবং সঙ্গীতপ্রিয়তা দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তাঁর সঙ্গীতপ্রিয়তা তিনি তাঁর মাতাপিতার কাছ থেকে লাভ করেছেন।

প্রবেশিকা পরীক্ষায় ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে উত্তীর্ণ হয়ে আঠারো বছর বয়সে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে ভর্তি হলেন। এ সময় থেকে তাঁর জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ও জটিল অধ্যায়ের সূত্রপাত হয় এবং এই জীবন তাঁর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়। প্রথমে তিনি প্রেসিডেন্সী ও পরে জেনারেল এসেম্ব্লিজ ইনষ্টিটিউশনে ভর্তি হন। ক্রমে ক্রমে তিনি এফ্-এ, বি-এ এবং বি-এল পরীক্ষা উত্তীর্ণ হন। সাহিত্য, অলঙ্কারশাস্ত্র, ন্যায়, দর্শন, গণিত, জ্যোতিষ, ইতিহাস ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর আগ্রহ ছিলো। Green-এর History of the English People, Alison-এর History of Europe এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পাঠ করেছিলেন। বিশেষ করে তিনি পাঠ করেছিলেন Gibbon-এর Decline and Fall of the Roman Empire। নরেন্দ্রনাথের কাব্যানুরাগেরও যথেষ্ট পরিচয় ছিলো। Wordsworth ছিলেন তাঁর প্রিয় কবি। দর্শনের ক্ষেত্রেও হার্বার্ট স্পেন্সারের দুরূহ দর্শন থেকে আরম্ভ করে কাণ্ট, শোপেনহাওয়ার, কোঁৎ, মিল্ প্রমুখ ব্যক্তির দর্শন বিশেষ ভাবে আয়ত্ত করেছিলেন।

শুধু পাশ্চাত্য দর্শন নয়, প্রাচ্য দর্শনেও তাঁর ব্যুৎপত্তি ছিলো। প্রথমে তাঁর ধারণা হয় হিন্দু দর্শন দুর্বল। কিন্তু পরে তিনি উপলব্ধি করেছেন, বহুদিন আগে হিন্দুদর্শন যে সত্যকে সিদ্ধান্ত স্বরূপ গ্রহণ করেছে, পাশ্চাত্য দর্শন তারই ক্ষীণ আভাস। পাশ্চাত্য দর্শন নরেন্দ্রনাথের বিশ্বাস ও সংস্কারকে বিচলিত করে। ডেকার্টের অহংবাদ, হিউম ও বেনের নাস্তিকতা, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ এবং সর্বোপরি স্পেন্সারের অজ্ঞেয়বাদ তাঁর মনকে বিভ্রান্ত করে দেয়। অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের অনুরোধে তিনি শেলীর কবিতা, হেগেলের দর্শন এবং ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাস পাঠ করতে আরম্ভ করেন। এগুলি তাঁর চিন্তা, অনুভূতি এবং ইচ্ছাকে প্রভাবিত করে।

এতো জ্ঞান চর্চার মধ্যে তাঁর কৌতুকপ্রিয়তা ও যুবজনোচিত ব্যবহার নষ্ট হয় নি। সঙ্গীত চর্চাও তখন তিনি নিয়মিত করেছেন। আহম্মদ খাঁর শিষ্য বেণীগুপ্তের কাছে তিনি সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁর কণ্ঠস্বর সুন্দর ছিলো এবং যে কোনো স্থানে তাঁর উপস্থিতিতেই গানের অনুরোধ আসতো। নৃত্যবিদ্যা এবং অভিনয় বিদ্যাও তাঁর জানা ছিলো। কেশবচন্দ্রের 'নববৃন্দাবন' নাটকে তিনি যোগীর ভূমিকা অভিনয় করেছিলেন।

দার্শনিক গ্রন্থগুলির প্রভাবে ক্রমে ক্রমে তিনি অনেকটা সংশয়বাদী হয়ে ওঠেন। তবে এই সংশয়ের পথেই বিদ্যমান্ ছিলো তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি। ফলে বিভ্রান্ত না হয়ে সংশয়বাদের প্রবণতায় যুক্তিশীলতা এসে জ্ঞানময় ও প্রেমময় ঈশ্বরকেই সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বহুদিন আগে থেকেই তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন। উদ্দেশ্য ছিলো সত্যসন্দর্শন। নিয়মিতভাবে আচার্যদের উপদেশ গ্রহণ, রামমোহনের প্রবন্ধ পাঠ, দেবেন্দ্রনাথ ও কেশবচন্দ্রের সঙ্গে আলোচনা ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে সাময়িকভাবে শান্তিলাভ করলেও তাঁর অন্তরে ঈশ্বর সন্দর্শনের ইচ্ছা আরো তীব্র হয়।

১৮৭০ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে সিমুলিয়ার রামকৃষ্ণ-শিষ্য সুরেন্দ্রনাথ মিত্রের গৃহে সতেরো বছরের যুবক নরেন্দ্রনাথের সঙ্গে পরমহংসদেবের প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। গান গাইবার জন্যেই তাঁর ডাক পড়েছিলো। গান শুনে শ্রীরামকৃষ্ণ মোহিত হন এবং তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে যেতে বলেন। এর মধ্যে নরেন্দ্রনাথের বিবাহের আয়োজন চলে, কিন্তু নরেন্দ্রনাথের এতে সম্মতি ছিলো না। ধর্মীয় বিষয়ে তাঁর বিভ্রান্তি দূর করবার জন্যে আত্মীয় রামচন্দ্র দত্ত তাঁকে দক্ষিণেশ্বরে পরমহংসদেবের কাছে যেতে পরামর্শ দিলেন। কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে নরেন্দ্রনাথ একদিন দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। রামকৃষ্ণ তাঁর সঙ্গে চিরপরিচিতের মতো ব্যবহার করলেন এবং নিজের বিশ্বাসের কথা বললেন। আরো বললেন, নরেন্দ্রনাথ নররূপী নারায়ণ—জীবের কল্যাণে তাঁর দেহধারণ। নরেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উন্মাদ সিদ্ধান্ত করলেন অথচ অত্যন্ত চিন্তাও এসে দেখা দিলো। ঠাকুরের প্রতি আকর্ষণও তিনি অনুভব করলেন। অন্তরের সঙ্গে সংগ্রাম করে অবকাশ মতো একদিন পদব্রজে তিনি দক্ষিণেশ্বরে এসে উপস্থিত হলেন। ঠাকুরের সম্মুখে নিজেকে তিনি সম্মোহিত বলে অনুভব করলেন; তাঁর তীব্র মনোবলও অন্তর্হিত হতে লাগলো। মাঝে মাঝে তিনি দক্ষিণেশ্বরে যেতে আরম্ভ করলেন। অবশ্য ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক সহসা ত্যাগ করতেও পারলেন না। কেশবচন্দ্র, বিজয়কৃষ্ণ প্রমুখ আচার্যের প্রভাবে ধর্মীয় বিষয়ে অনেক পরিমাণে সিরিয়াস হয়ে উঠেছিলেন। নিরাকার ধ্যানই নরেন্দ্রনাথের ভালো লাগতো। ঠাকুর তাঁর ওপরে কোনো চাপসৃষ্টি না করে সেইভাবে উপদেশ দিয়েছেন, ব্রাহ্মসমাজে যেতেও বারণ করেন নি। রামকৃষ্ণ-সান্নিধ্যে দীর্ঘ পাঁচ বছর পরে সংশয় দূরীভূত হয়ে বিশ্বাস এসে দেখা দিলো। ঠাকুরের কথাকে সত্য বলে তিনি বিশ্বাস করলেন।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে পিতা বিশ্বনাথ পরলোক গমন করলেন। অসহায় যুবক নরেন্দ্রনাথ অর্থকষ্ট ও সাংসারিক দুর্ভোগে পড়লেন। তীব্র মনোবল দিয়ে তিনি দারিদ্র্যের সঙ্গে সংগ্রাম করছেন। অন্যদিকে সুবিধাবাদীরা ঠাকুরের কাছে তাঁর নামে অপবাদ দিচ্ছে। এই সঙ্কটের মধ্যে অন্তরের বিশ্বাস তিনি হারান নি। একদিন ঠাকুরের অনুরোধে কালীমূর্তির কাছে নরেন্দ্রনাথ যা ইচ্ছে প্রার্থনার অনুমতি পেলেন। কিন্তু তিনি ঐশ্বর্য আকাঙ্ক্ষা করলেন না, চাইলেন ভক্তি। ঠাকুর নরেন্দ্রনাথকে আশীর্বাদ করলেন. বললেন, মোটা ভাত-কাপড়ের অভাব তাঁর হবে না। অভাবের তীব্রতা সত্যিই অনেকটা দূরীভূত হলো। এ সময়ে জীবিকার জন্যে তিনি বিভিন্ন কাজ করেন। কিছুদিন তিনি শিক্ষকতাও করেন। অ্যাটর্ণি অফিসে শিক্ষানবিশী করে পরে অর্থাভাবে তা ছেড়ে দেন। এ সময়ে কয়েকখানি পুস্তক অনুবাদ করে অর্থোপার্জন করতে থাকেন।

১৮৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগষ্ট শ্রীশ্রীঠাকুরের মহাপ্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুর কিছু দিন পূর্ব থেকে তিনি একা নরেন্দ্রের সান্নিধ্যে থাকতেন এবং তাঁকে প্রয়োজনীয় উপদেশ দিতেন। ঠাকুর তাঁর আদর্শ প্রচারের সবকিছু দায়িত্ব তাঁকেই দেন। সংগঠন ও প্রচারের মধ্যে দিয়ে নরেন্দ্রনাথ গুরু প্রদত্ত দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালন করেন। ঠাকুরের ভস্মাবশেষ নিয়ে তাঁর গৃহী ও সন্ন্যাসী ভক্তদের মধ্যে মতবিরোধ উপস্থিত হয়। চৌদ্দ বছর পরে তা বেলুড় মঠে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো। মঠ স্থাপনের পর থেকেই সংগঠনকে তিনি দৃঢ় করবার চেষ্টা করেছেন। দলাদলির মধ্যে ধৈর্য সহকারে সব বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হয়েছেন। সাংসারিক দুরবস্থাও তাঁকে মাঝে মাঝে বিব্রত করেছে, কিন্তু দৃঢ় মনে তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে গেছেন। ব্রাহ্ম মুহূর্তে গাত্রোত্থান করে গীতা, ইমিটেশন অব ক্রাইস্ট, বিভিন্ন ধর্মের ধর্মগ্রন্থ, রামকৃষ্ণ প্রসঙ্গ ইত্যাদি গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে আলোচনা করতেন।

ইতিমধ্যে গুরুভ্রাতাদের সঙ্গে তিনি বহু স্থানে দেশপর্যটন ও তীর্থ ভ্রমণ করেছেন। রোজনামচা না থাকায় সেগুলির সন তারিখ অজ্ঞাত। তবে ১৮৯১ খৃষ্টাব্দের প্রথম থেকে বিবেকানন্দ গুরুভ্রাতাদের সঙ্গ ত্যাগ করে একাকী পদব্রজে বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেন। এ সময়ে তিনি বিচিত্র অভিজ্ঞতা লাভ করেন এবং খ্যাতনামা সন্ন্যাসী ও মনীষীদের সঙ্গেও সাক্ষাৎ করেন। তিনি শিক্ষার্থীর সরলতা নিয়ে তাদের কাছ থেকে বহু জ্ঞান সঞ্চয় করেন। ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দে পরিব্রাজক বিবেকানন্দ বরাহনগরের মঠ ত্যাগ করে পথে বের হন, এবং ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বরে তাঁকে দেখা যায় দাক্ষিণাত্যের পথে পথে। ইতিমধ্যে তাঁর মনোজগতে এসেছে অনেক পরিবর্তন। তিনি তাঁর চিত্তস্থিত ধ্যানময় ভারত ছাড়াও বাস্তব অভিজ্ঞতায় প্রত্যক্ষ করলেন বর্তমান ভারত। এ ভারতবর্ষে একদিকে আছে দুর্ভিক্ষ মহামারী, দুঃখ দৈন্য এবং রোগযন্ত্রণা, অন্য দিকে আছে ধনীর বিলাসমোহ। নির্যাতিত মানবাত্মার জন্যে তাঁর প্রাণ কেঁদে উঠলো। পরিব্রাজক বেশে বিবেকানন্দ বৃন্দাবন, কাশী, অযোধ্যা, আগ্রা, হাতরাস, হৃষীকেশ, গাজীপুর, বৈদ্যনাথ ধাম ইত্যাদি বহু স্থানে বিভিন্ন সময়ে পরিভ্রমণ করেন। তার পর হিমালয় অঞ্চলে কিছুদিন পদব্রজে ভ্রমণ করেন। নৈনিতাল, আলমোড়া, গাড়োয়াল, দেরাদুন, মীরাট, আলোয়ার, জয়পুর ও খেতড়ি এবং গুজরাট, বম্বে, দাক্ষিণাত্যে মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদের বিভিন্ন অঞ্চলে বিবেকানন্দ দীর্ঘদিন পরিভ্রমণ করে ভারতবর্ষের মানুষ, সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভ করলেন।

ইতিমধ্যে অমেরিকার শিকাগো মহামেলার অঙ্গ হিসেবে একটি বিরাট ধর্মসভার আয়োজন চলছিলো। বিবেকানন্দের কয়েকজন উৎসাহী মাদ্রাজী শিষ্য তাঁকে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি হিসেবে সভায় পাঠাতে মনস্থ করেন। নানা বাধা বিপত্তির মধ্যে চাঁদা সংগ্রহ চলতে

লাগলো। স্বামিজীও যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। মায়ের অনুমতি এবং শিষ্যমণ্ডলী সংগৃহীত পাথেয় নিয়ে তিনি ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ৩১শে মে বম্বে থেকে জাহাজে শিকাগো অভিমুখে যাত্রা করলেন। যাবার পথে বিভিন্ন বন্দরে তিনি জাহাজ থেকে নেমে সেই সব দেশ সম্পর্কে ধারণা গ্রহণ করলেন। কোথাও বিদ্রূপ, কোথাও প্রতারণা কোথাও বিস্মিত দৃষ্টি ইত্যাদি লাভ করে বিবেকানন্দ শিকাগোর পথে অগ্রসর হলেন। পথে জাপান তাঁকে মুগ্ধ করে। অবশেষে জাহাজ ভ্যাঙ্কুভার বন্দরে নোঙর ফেললো। এখান থেকে রেলপথে কানাডার মধ্যে দিয়ে তিনদিন পরে স্বামিজী শিকাগোয় প্রবেশ করলেন। বিদেশী হিসেবে তিনি অসহায় হয়ে পড়লেন, অর্থকষ্ট, অপরের বিদ্রূপ কৌতুক ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে দিন কাটতে লাগলো। ওদিকে খবর এলো ধর্মসভা হতে অনেক দেরী। সভার নিয়মানুযায়ী পরিচয় পত্র নেই, স্থান পাবেন কিনা তা নিয়ে সংশয়ও এসে উপস্থিত হলো। তবু মনোবল নিয়ে বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে তাঁর উদ্দেশ্যের পথে সংগ্রাম করতে লাগলেন। শিকাগোর চেয়ে বোষ্টনে খরচ কম পড়ে জেনে তিনি বোষ্টনে যাত্রা করেন। পথে ব্রিজি মেডোস নাম্নী এক মহিলার সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। তিনি বিবেকানন্দকে আশ্রয় দিলেন। পরে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রীকভাষাবিদ্ জি. এইচ্. রাইটের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়। তিনি স্বামিজীর সঙ্গে কথাবার্তায় মুগ্ধ হয়ে ধর্মসভায় যোগ দেবার বিষয়ে সহায়তা করেন। শেষে আবার শিকাগোয় ফিরে মিসেস হেল্ নামে এক মহিলার সহায়তায় স্বামিজী মহাসভার কার্যালয়ে যান এবং অন্যান্য প্রাচ্য প্রতিনিধিদের সঙ্গে একত্র থাকবার সুযোগ পান।

১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর স্মরণীয় দিন। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি উপস্থিত। বিবেকানন্দ প্রদত্ত প্রথম সম্বোধন 'Sisters and Brothers of America' সন্ন্যাসীর

বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের স্পর্শ এনে দিলো। জনসমুদ্র করতালিতে নবীন সন্ন্যাসীকে করলো অভিনন্দিত। প্রতিনিধিদের সকলেই নিজ নিজ সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেছেন, কিন্তু বিবেকানন্দের স্বরে প্রকাশ পেলো বিশ্ব-ভ্রাতৃত্ববোধ, সর্বধর্ম সমন্বয়ের কথা। তিনি ঘোষণা করলেন সব ধর্মের গন্তব্য স্থান এক। প্রথম দিনের বক্তৃতার পরে 'আমাদের মধ্যে মতভেদ কেন?' নামে একটি ক্ষুদ্র বক্তৃতা ছাড়া ১৯শে সেপ্টেম্বরের আগে অন্য আর কোনো বক্তৃতা দেন নি। ১৯ তারিখে তিনি তাঁর হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় প্রসিদ্ধ প্রবন্ধটি পাঠ করেন। হিন্দু ধর্মের সার অত্যন্ত অল্পকথায় এবং অত্যন্ত পরিষ্কার ভাবে তিনি আলোচনা করেন। তিনি তাঁর বক্তৃতায় বহুর মধ্যে একত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন এবং পাশ্চাত্য দেশে প্রচলিত ভ্রান্ত সংস্কার বিনষ্ট করলেন। ২২শে সেপ্টেম্বর তিনি একটি বক্তৃতা দেন। বক্তৃতার বিষয় বস্তু,—বেদান্তদর্শনের সঙ্গে বর্তমান প্রচলিত হিন্দুধর্মের সম্বন্ধ। ২৪ তারিখে হিন্দুধর্মের সার' নামে একটি বক্তৃতা দেন। মহাসভার মূল অধিবেশনে এবং বৈজ্ঞানিক শাখায় স্বামিজী দশ-বারোটি বক্তৃতা দেন। মানুষের জ্ঞানের সাধনা জড় ও চৈতন্য জগতে সত্যের জগতে একই সত্যের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, সার্বজনীন ধর্মের এই মর্মকথাই তিনি প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে। ২৭শে সেপ্টেম্বর ধর্ম-সভার শেষ অধিবেশনে ঘোষণা করলেন যে, কোন একটিই মাত্র ধর্ম জগতে শেষ পর্যন্ত প্রতিষ্ঠা পাবে, এ ধারণা ভুল।

বিবেকানন্দের বক্তৃতা পাশ্চাত্য জগতের জনসাধারণকে প্রভাবিত করলো। বিভিন্ন সংবাদ পত্র তাঁর সম্পর্কে মুখরিত হলো। কয়েক মাস ধরে অত্যন্ত পরিশ্রমকে স্বীকার করেও বিভিন্ন স্থানে তিনি বক্তৃতার পর বক্তৃতা দিয়ে গেছেন। এমন কি এক একসময় সপ্তাহে বারো চৌদ্দ কিংবা তারও বেশি বক্তৃতা দিয়েছেন। পাশ্চাত্য দেশের বিভিন্ন সত্যানুসন্ধিৎসু অধ্যাপক দার্শনিক, থিয়োজফিস্ট্ তাঁর সঙ্গে

স্বেচ্ছায় আলোচনা করতে দলে দলে এসেছেন। আবার তারই সঙ্গে সঙ্গে তাঁর বিরুদ্ধে বিভিন্ন কুৎসাও চলতে লাগ্‌লো। তিনি নিউইয়র্কের প্রশ্নোত্তর ক্লাসে নিয়মিত ভাবে জ্ঞানযোগ ও রাজযোগ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন। ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে তাঁর এ বিষয়ে পরিশ্রম চূড়ান্ত হয়। আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলভ্রমণ শেষ করে অভয়ানন্দ কৃপানন্দ প্রমুখ সন্ন্যাসীর হাতে আমেরিকায় প্রচার কার্যের ভার দিয়ে আগষ্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে স্বামিজী নিউইয়র্ক থেকে প্যারী এবং সেখান থেকে লণ্ডনে এসে উপস্থিত হলেন। এই 'Cyclonic Hindoo' বিভিন্ন স্থানে আন্দোলন সৃষ্টি করে ইংলণ্ডকেও তাঁর বাগ্মিতা ও পাণ্ডিত্য দিয়ে মুগ্ধ করলেন। দ্রুত উন্নতিশীল, আপাত মনোরম সভ্যতাকে বেদান্তের ত্যাগ বৈরাগ্য ও বিবেকের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত না করলে তার ধ্বংস অবশ্যভাবী একথা তিনি বার বার ঘোষণা করলেন। একমাসের মধ্যেই স্বামিজী লণ্ডনে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। এখানেই একটি বক্তৃতা সভায় মিস্ মার্গারেট ই. নোবলের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। ইনিই পরবর্তীকালের ভগিনী নিবেদিতা। ইনি তদানীন্তনকালে স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। স্বামিজীর বক্তৃতায় ও চরিত্র-মাধুর্যে তিনি আকৃষ্ট হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

স্বামিজী আবার আমেরিকায় গেলেন। গুড্‌উইন নামে একজন অনুলেখক এবার থেকে বক্তৃতাগুলো লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন। নিউইয়র্কে এসে স্বামিজী বেদান্ত আলোচনা এবং যোগশিক্ষার জন্যে স্থায়ী কেন্দ্র গঠন করতে সচেষ্ট হলেন। স্থায়ী ভাবে তিনি নিউইয়র্কে 'বেদান্ত সোসাইটি' প্রতিষ্ঠা করে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই এপ্রিল তিনি লণ্ডনে রওনা হলেন। এখানে বিভিন্ন স্থানে তিনি বক্তৃতা দেন। বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হয়ে তিনি অক্সফোর্ডে ২৮শে মে Max Muller এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। রামকৃষ্ণ ও ভারতবর্ষ সম্পর্কে তাঁর জ্ঞান স্বামিজীকে বিস্মিত করে।

ইতিমধ্যে বিদেশী শিষ্য শিষ্যা রূপে স্বামিজী মিস্ মুলার, মিস্ নোবল, মিঃ গুড্উইন, মিঃ ষ্টার্ডি প্রমুখ ব্যক্তিকে পান। এবার ইংলণ্ডে এসে কাপ্টেন সেভিয়ার ও তাঁর স্ত্রীকে ভক্তরূপে পেলেন। এঁদের চেষ্টায় বিশ্রামের জন্যে স্বামিজী সুইজারল্যাণ্ডে যান। জুলাইয়ের শেষে লণ্ডন থেকে জেনেভায় যান এবং তারপর সুইজারল্যাণ্ডে উপস্থিত হন। সেখান থেকে জার্মানীতে যাবার আমন্ত্রণ পেয়ে সেখানে যান। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অধ্যাপক পল ডয়সনের অতিথিরূপে সেখানে বেদান্তালোচনা দিয়ে তিনি অধ্যাপককে মুগ্ধ করেন। স্বামিজীর সঙ্গে তিনি লণ্ডনে এলেন। লণ্ডনে স্থায়ী প্রচারের জন্যে স্বামিজী অভেদানন্দের ওপরে দায়িত্বভার অর্পণ করলেন। সারদানন্দকে তিনি আমেরিকায় পাঠালেন। অক্টোবর ও নভেম্বরে স্বামিজী অদ্বৈতবাদের শ্রেষ্ঠতম সিদ্ধান্তগুলো বিশ্লেষণ করে কিছু বক্তৃতা করেন।

স্বামিজী ভারতে প্রত্যাবর্তন করা মনস্থ করলেন। স্থানীয় গুণমুগ্ধ ব্যক্তিরা ১৩ই ডিসেম্বরে Royal Society of Painders সমিতির পিকাডেলীর বিরাট হলে বিদায় অভিনন্দন জানান। সেভিয়ার দম্পতিকে নিয়ে ১৬ই ডিসেম্বর তিনি লণ্ডন ত্যাগ করলেন। সেখান থেকে ফ্লোরেন্স, রোম ইত্যাদি পরিদর্শন করে নেপ্ল্সে আসেন এবং ভিসুভিয়াস ও পম্পাই দর্শন করেন। তারপর সাউদাম্পটন থেকে আসা ভারতগামী জাহাজে উঠে সদলবলে তিনি ৩০শে ডিসেম্বর ভারতে রওনা দিলেন। বিবেকানন্দের চার বছরের দিগ্বিজয় পর্ব শেষ হলো। এই ভ্রমণের মধ্যে দিয়ে প্রাচ্যের সঙ্গে পাশ্চাত্যের তুলনা করবার সুযোগ পেলেন। এই অভিজ্ঞতাকে তিনি বহন করে স্বদেশ প্রেমে সংযুক্ত করলেন। এবার তাঁর কর্মকেন্দ্র হলো ভারতবর্ষ।

কলকাতায় তিনি প্রত্যাবর্তন করলে রাজা স্যার রাধাকান্ত দেবের প্রাসাদে তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। স্বামিজী পতিত

ভারতবাসীর প্রতি তাঁর সহানুভূতি ও প্রেম ব্যক্ত করে, যুবসমাজকে জাগ্রত হয়ে আত্মোৎসর্গ করতে আহ্বান করলেন। এই সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রচুর বক্তৃতাদানের মাধ্যমে তাঁর বিশিষ্ট আদর্শকে সর্বসমক্ষে প্রচার করলেন। বিভিন্ন আশ্রম প্রতিষ্ঠায় তিনি ব্যগ্র হলেন। অতিরিক্ত পরিশ্রমে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙে যায়। তিনি আলমোড়া গেলেন। দৈহিক বিশ্রাম পেলেও মানসিক বিশ্রাম তেমন হয় নি। আলমোড়া ত্যাগ করবার পর তিনি অসুস্থ হলেন। তিনি কাশ্মীরে কিছুদিন অবস্থান করলেন। সেখান থেকে রাওয়ালপিণ্ডি, জম্মু, শিয়ালকোট, লাহোর, আলোয়ার, জয়পুর ইত্যাদি স্থান পরিভ্রমণ করেন ও সম্বর্ধিত হন। উত্তর ভারত ভ্রমণ শেষ করে ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারীতে তিনি কলকাতায় ফিরলেন। এই সময়ে বেলুড় মঠ নির্মিত হয় এবং এ বিষয়ে পাশ্চাত্য শিষ্যরা যথেষ্ট সহায়তা করেছিলেন। কলকাতায় এসে এ বছরের প্রায় অধিকাংশ সময়েই তিনি মঠ প্রতিষ্ঠা, সংঘের গঠনমূলক কার্যপ্রণালীর শৃঙ্খলাবিধান এবং শিক্ষাদানে ব্যস্ত ছিলেন। পাশ্চাত্য সমাজের বন্ধন কাটিয়ে মিস্ মুলার ও মিস্ নোবল ভারতে এলেন। স্বামিজী নোবলকে ব্রহ্মচর্যে দীক্ষিত করলেন।

অত্যধিক পরিশ্রমে স্বামিজী আবার অসুস্থ হলেন এবং বায়ু পরিবর্তনে দার্জিলিং গেলেন। হঠাৎ কলকাতায় প্লেগ রোগের বিস্তারের সংবাদে সেবার জন্যে তিনি কলকাতায় ফিরে এসে সেবাধর্মের মহত্ত্ব আচরণের মধ্যে দিয়ে প্রদর্শন করলেন। এরপর পাশ্চাত্য শিষ্য শিষ্যাসহ তিনি হিমালয় ভ্রমণে যান। ভারতবর্ষ ও তার ইতিহাস সম্পর্কে শিক্ষাদানের জন্যেই এই ভ্রমণ। নিবেদিতাকে নিয়ে তিনি অমরনাথে গমন করেন। ৩০শে সেপ্টেম্বর তিনি হঠাৎ ক্ষীর ভবানী অভিমুখে চলে যান এবং উগ্র তপস্যা সুরু করেন। মনের বিচিত্র পরিবর্তন ও শক্তি নিয়ে তিনি শ্রীনগরে ফিরলেন। সেখান থেকে লাহোর হয়ে তিনি আবার বেলুড়ে এলেন।

এখানে এসে পরিশ্রম যেন আরও বাড়লো। চিকিৎসকদের নিষেধ সত্ত্বেও সংগঠন ও প্রচারের জন্যে পরিশ্রম ছাড়াও বহু দর্শনার্থীর সঙ্গে আলাপ আলোচনা করতেন। শরীর এতে যেন ভেঙে পড়লো।

আবার পাশ্চাত্য দেশে যাবার সঙ্কল্প করলেন তিনি। স্বাস্থ্যের উন্নতি হবে মনে করে শিষ্যরা এতে আপত্তি করলেন না। নিবেদিতার সঙ্গে স্বামিজী ৩১শে জুলাই লণ্ডনে পৌঁছোলেন। সেখান থেকে ১৬ই আগষ্ট নিউইয়র্ক গমন করলেন। উভয় স্থানেই তিনি তাঁর কর্তব্য যথারীতি সম্পাদন করলেন। তারপর তিনি তিন মাস প্যারিসে অবস্থান করে পূর্ব ইউরোপ ভ্রমণের জন্যে যাত্রা করলেন। জার্মানীর মধ্যে দিয়ে ভিয়েনা হয়ে হাঙ্গেরী, সার্বিয়া, বাল্‌গেরিয়া এবং শেষে ইস্তাম্বুল এসে পৌঁছোলেন। পরে এথেন্স ও কায়রো গমন করে ছিলেন। এই সমস্ত ভ্রমণের ফলে বিভিন্ন দেশের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিকগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। আমাদের দেশের অবস্থা এবং বিভিন্ন দিকগুলিকে তুলনামূলকভাবে দেখতে সমর্থ হয়েছিলেন।

১৯০০ খ্রীষ্টাব্দের ৯ই ডিসেম্বর তিনি অপ্রত্যাশিত ভাবে বেলুড় মঠে এসে উপস্থিত হন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ৩রা জানুয়ারীতে অসুস্থ শরীরেও তিনি মায়াবতী মঠে মিসেস সেভিয়ারের কর্মপদ্ধতি পরিদর্শন করেন। শিষ্য স্বরূপানন্দের সঙ্গে তিনি আশ্রম, প্রচারকার্য এবং 'প্রবুদ্ধ ভারত' পত্রিকা পরিচালনা বিষয়ে আলোচনা করেন। এই সময়ে হাঁপানিতে অবসন্ন হয়ে পড়েন। ১৩ই জানুয়ারী তাঁর শিষ্যরা অষ্টত্রিংশ জন্মজয়ন্তী পালন করলেন। এই সময়ের একটি ঘটনা স্মরণীয়। স্বামিজীর চোখে পড়ে, রামকৃষ্ণের একটি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে তাকে পূজা করা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি এজাতীয় পূজা বন্ধ করতে নির্দেশ দিলেন। রামকৃষ্ণ নিজেও এটা অপছন্দ করতেন। অত্যন্ত তুষারপাতে অধিকতর শারীরিক অসুস্থতার আশঙ্কায় তাঁকে

২৪শে জানুয়ারী বেলুড়ে ফিরতে হলো। এখানে ব্রহ্মচারীরা ধ্যান, শাস্ত্রালোচনা, ব্যায়াম, ব্রহ্মচর্য পালন ইত্যাদি নিষ্ঠার সঙ্গে করছিলেন। স্বামিজীর সান্নিধ্যে তাদের উৎসাহ আর বেড়ে গেলো।

এই সময় ঢাকা থেকে তাঁর ডাক আসে। পূর্ববঙ্গ এবং আসামের তীর্থগুলি দেখবার আগ্রহও তাঁর ছিলো। ঢাকায় তিনি সম্বর্ধিত হলেন। সেখানে যথারীতি বক্তৃতাদি করে সেখান থেকে কামাখ্যা-পীঠ ও চন্দ্রনাথ যাত্রা করেন। এই সময়ে শিলং ভ্রমণও করেন।

পূর্ববঙ্গ ও আসাম ভ্রমণ শেষ করে তিনি আবার বেলুড়ে ফিরলেন। পূর্ব থেকেই বহুমূত্ররোগে তিনি ভুগছিলেন। এবারে দেখা দিলো শোথ। সকলের উদ্বেগকে তিনি কৌতুকহাস্যে উড়িয়ে দিতেন এবং প্রচুর পরিশ্রম করতেন। এই সময়ে মঠে Encyclopaedia Britanica নতুন কেনা হয় এবং বিবেকানন্দ সর্বদা এই বইগুলি নিয়ে বসে থাকতেন। জুলাই আগষ্ট মাসে তিনি কিছু সুস্থ হন। এই সময়ে মঠে শাস্ত্র-নির্দিষ্ট বিভিন্ন প্রতিমাপূজা অনুষ্ঠিত করে হিন্দুসমাজের ভ্রান্ত ধারণা নিরসিত করেন। গোঁড়া হিন্দুরা মঠের কাজগুলোকে অহিন্দুজনোচিত বলে মনে করতেন। কিন্তু বিবেকানন্দ নিরাকারতত্ত্ব থেকে সাকারতত্ত্বের পার্থক্য দেখতে পান নি। এই সময়ে তিনি স্যাণ্ডার্সের চিকিৎসাধীনে ছিলেন। দৈহিক বিভিন্ন বাধাবিপত্তির মধ্যেও তিনি একদল নিঃস্বার্থপর বলিষ্ঠ চরিত্রবান্ ও আজ্ঞানুবর্তী যুবকের স্বপ্ন দেখতেন। তাদের সহযোগিতায় তাঁর আদর্শ বাস্তবে রূপায়িত হবে।

১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসের শেষভাগে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হলে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে বহু প্রতিনিধি কলকাতায় আসেন এবং দেশপ্রেমিক সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের সঙ্গে দলে দলে সাক্ষাৎ করেন। এই সময় একটি বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্যে তিনি তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করেন। ১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী

মাসে জাপানী পণ্ডিত ডঃ ওকাকুরার নিমন্ত্রণে বুদ্ধগয়ায় যাবার পরিকল্পনা এবং সেখান থেকে কাশীতে যাবার পরিকল্পনা করেন। স্বামিজীর পরিব্রাজক জীবনের এটাই শেষ ভ্রমণ। শ্রীরামকৃষ্ণের উৎসব উপলক্ষে বেলুড়ে ফিরে স্বামিজী অত্যন্ত অসুস্থ হয়ে পড়লেন। এই সময়ে কারো পরামর্শ গ্রাহ্য করতেন না, অনেকটা স্বাধীন ইচ্ছার মূল্য দিতেন। মার্চ মাসের প্রথম থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি সকলের অনুরোধ উপরোধ অগ্রাহ্য করে অত্যন্ত পরিশ্রম করতেন। জুন মাস থেকে মঠের বিষয়ে অনেকটা উদাসীন হয়ে পড়লেন। যে কোনো বিষয়ের উপদেশের ক্ষেত্রে তিনি অন্যের কাছে যেতে নির্দেশ দিতেন। মহাপ্রয়াণের তিন দিন আগে তিনি তাঁর দাহকার্যের স্থান নির্দেশ করে দেন।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দের ৪ঠা জুলাই তাঁর মহাপ্রয়াণের দিন সেদিন তাঁর আচার আচরণে কিছু অভিনবত্ব ছিলো! এমন কি মঠের প্রাঙ্গণে "মন চল নিজ নিকেতনে" গান গাইতে গাইতে পাদচারণা করেছেন। সকলের সঙ্গে ব্যবহারে অসুস্থতার কোনো লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। কিন্তু রাত্রি ৯টায় তিনি তার শয়নকক্ষে অনন্ত নিদ্রায় অভিভূত হলেন।

মহাপুরুষকে ভক্ত ভাবাবেশের মধ্যে দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে। তাই ভক্তচিত্তে কোনো প্রতারণার ইচ্ছে না থাকলেও সংস্কার ও বিশ্বাসের প্রাবল্যে ভক্ত অলৌকিকতাকে স্বীকার করে কিংবা অলৌকিকতা রচনা করে। আমরা স্বামিজীকে মহাপুরুষ রূপে ধরে নিলে তাঁর সাহিত্য বিচারে অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। সুতরাং সাহিত্য-বিচারের ক্ষেত্রে তাঁর লৌকিক জীবনকাহিনীটুকুরই প্রয়োজন উপলব্ধি করি।

১১

বিবেকানন্দের সাহিত্য

অন্য দেশের মতো আমাদের দেশেও অনেকে সাহিত্য-সৃষ্টি করেছেন—যাঁদের প্রেরণা সাহিত্যিক নয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বিদ্যাসাগরের কথা উল্লেখ করা যায়; তিনি শিক্ষা প্রসারের প্রেরণায় পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে গিয়ে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন। বিবেকানন্দের ক্ষেত্রও অনুরূপ। তাঁর উদ্দেশ্য ছিলো, ভারতের অধ্যাত্মবাণীকে বিশ্বের কাছে প্রচার করা এবং এক উদার সমুন্নত জ্ঞানালোকে ভারতকে নবরূপে গঠন করা। প্রাচীন ও আধুনিক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য শ্রেষ্ঠ-জ্ঞান সঞ্চয় করে কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও জড়ভাব সম্পন্ন দেশকে তিনি নতুন করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন।

বিবেকানন্দের অধিকাংশ বই ইংরিজীতে লেখা এবং তারও অধিকাংশ বক্তৃতার অনুলেখ। অনুলিখিত রচনার বহিরঙ্গ বিচার প্রায় অচল, এবং অন্তরঙ্গের সঙ্গে বহিরঙ্গের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় গোঁড়া আলোচকরা এ জাতীয় গ্রন্থকে আলোচনা বর্হিভূত করে সাধারণতঃ দেখেন। বিবেকানন্দেব সাহিত্যবিচাব ব্যাপকতাকে আশ্রয় করলেও এ ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের পরিধির মধ্যে আলোচনা করলে প্রতিশ্রুতি পালন চলে। মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যই প্রকৃত পক্ষে সাহিত্যিকের অন্তরের সঙ্গে তার অন্তরঙ্গ ও বহিরঙ্গের মাধ্যমে সংযুক্ত হয়। বিবেকানন্দের বাংলা রচনা অতি সামান্য।

'পরিব্রাজক' ('বিলাত যাত্রীর পত্র') 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'ভাববার

কথা', 'বর্তমান ভারত' ইত্যাদি গ্রন্থ, সঙ্কলিত বাংলা পত্রাবলী। মুষ্টিমেয় কবিতা তাঁর রচিত বাংলাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।

বিবেকানন্দের সাহিত্যকে সাহিত্য পদ বাচ্য করে তোলবার মূলে ছিলো তাঁর সাহিত্যরুচি। দেশী ও বিদেশী অতীত ও বর্তমান সাহিত্যিকদের রচনার সঙ্গে তাঁর সুগভীর পরিচয় ছিলো। এগুলি সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট পছন্দ অপছন্দও ছিলো। তাঁর সাহিত্যানুরাগ সম্পর্কে সারদানন্দের লীলাপ্রসঙ্গ মহেন্দ্র দত্তের স্মৃতিকথা ইত্যাদি জীবনীমূলক গ্রন্থে ইঙ্গিত আছে। ইংরেজ কবি ও সাহিত্যিকদের মধ্যে মিল্টন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রণ, হ্যামিল্টন ও শেলী তাঁর প্রিয় ছিলো। মিল্টনের কবিতা তিনি আবৃত্তি করতেন। এদেশীয় প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে কালিদাসের কুমারসম্ভব, মেঘদূত ও শকুন্তলা এবং ললিত-বিস্তরের সঙ্গে তার বিশেষ পরিচয় ছিলো। এদেশীয় সমকালীন ও প্রাগাধুনিক সাহিত্যের মধ্যে ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল ও বিদ্যাসুন্দর তিনি পাঠ করেছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও মাইকেলের সাহিত্য তাঁর বিশেষ প্রিয় ছিলো। দীনবন্ধুর নীলদর্পণ বা সধবার একাদশীর অনেক সংলাপই তাঁর মুখস্থ ছিলো এবং কথাবার্তায় তা ব্যবহার করতেন প্রায়ই। সুরেন্দ্রনাথ মজুমদারের 'সবিতা-সুদর্শন' পাঠ করে তিনি আনন্দ পেতেন। গিরিশচন্দ্র শুধু তাঁর বন্ধু ছিলেন না, তাঁর অন্যতম প্রিয় সাহিত্যিকও ছিলেন।

ভারতীয় বেদ-উপনিষদের যুগ থেকে সমকালীন সাহিত্য এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য দেশের হোমার দান্তে মিল্টনের কাব্য থেকে আরম্ভ করে বিদেশী সমকালীন সাহিত্য—এই বিরাট পরিধির মধ্যে তাঁর চিন্তা ও অনুভূতিপ্রবণ মন যাতায়াত করতো। স্বামিজীর অন্তরঙ্গ ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের আত্মস্মৃতিতে জানা যায় যে, তাঁর সংশয়ের অশান্তির মধ্যে শেলীর কবিতা এবং বিখ্যাত Imitation of Christ বইটি তাঁর প্রাণে শান্তি এনে দিতো। জয়দেব এবং ভারতচন্দ্র তাঁর

অধীত হলেও তিনি এঁদের কাব্যের সমালোচনাও করেছেন নির্ভীক ভাবে। অধ্যাপক অশ্রুকুমার সিকদারের ভাষায়,—'তাঁর মতে যে সাহিত্য ক্লীবতাকে প্রশ্রয় দেয়, ভাষার অতিমাধুর্য যেখানে ভাবকে আচ্ছন্ন করে, যে সাহিত্য রুচিবিগর্হিত, যার মধ্যে বলিষ্ঠতা, ওজস্বিতা ও আদর্শবাদের অভাব, সে সাহিত্য স্বামিজীর মতে, অন্য বৃহত্তর গুণের উপস্থিতি সত্ত্বেও, সর্বৈব নিন্দনীয়।" মাইকেলের প্রশস্তি করতে গিয়ে স্বামিজী বলেছেন,—'ঐ একটা অদ্ভুত genius তাদের দেশে জন্মেছিল। মেঘনাদবধের মত দ্বিতীয় কাব্য বাংলা ভাষাতে তো নেই-ই, সমগ্র ইউরোপেও এমন একখানা কাব্য ইদানীং পাওয়া দুর্লভ।' সাহিত্যের বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গের ক্রমাধুনিকতা সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। তাঁর মতে মুকুন্দরাম ছিলেন সে যুগের বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবি। গিরিশচন্দ্রের গৈরিশছন্দ তাঁকে অত্যন্ত আকৃষ্ট করেছিলো। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর মতামত ও চিন্তাধারা 'ভাববার কথা' গ্রন্থের অন্তর্গত 'বাঙ্গলা ভাষা' প্রবন্ধে প্রকাশ পেয়েছে। বঙ্গভূমি পত্রিকার সম্পাদক বৈষ্ণবচরণ বসাক সম্পাদিত সঙ্গীতকল্পতরু (পরবর্তীকালে যার পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ বিশ্বসঙ্গীত) গ্রন্থটির তিনি সঙ্গীত বিষয়ক দীর্ঘ ভূমিকা রচনা করেছেন।

বাংলা ভাষার ক্ষেত্রে বিবেকানন্দ একটি নতুন রীতির প্রবর্তন করেছেন। তাঁর বাগ্মিতা লৈখিক ভাষাকে অত্যন্ত প্রভাবিত করে তাঁর গদ্যকে করেছে অত্যন্ত গতিসম্পন্ন ও বাস্তব। তদনুযায়ী ভাষাকে সংস্কার করতে গিয়ে তিনি চলিত গদ্যের প্রয়োজন অনুভব করেছেন। সাধু গদ্য স্থান বিশেষে ব্যবহার করলেও তার মধ্যে তিনি স্বাচ্ছন্দ্য এনেছেন। অধ্যাত্মচিন্তা ও সমাজচিন্তাকে এতো সহজভাবে প্রকাশ করবার সামর্থ্য সমকালীন প্রাবন্ধিকদের মধ্যে তেমন দেখা যায় না।

'পরিব্রাজক' গ্রন্থটি প্রকৃতপক্ষে পত্রসঙ্কলন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে জুন স্বামী বিবেকানন্দ কলকাতা থেকে গোলকোণ্ডা জাহাজে দ্বিতীয়বার বিলেতযাত্রা করেন। সঙ্গে ছিলেন স্বামী তুরীয়ানন্দ ও ভগিনী নিবেদিতা। উদ্বোধন-সম্পাদক স্বামী ত্রিগুণাতীতানন্দের অনুরোধে স্বামিজী নিয়মিত ভাবে তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্ত পাঠান। পত্রাকারে লেখা পরিব্রাজকরূপে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা ১ম ও ২য় বর্ষের বিভিন্ন সংখ্যায় 'বিলাত যাত্রীর পত্র' রূপে প্রকাশিত হয়। কয়েক বছর পরে স্বামী সারদানন্দের তত্বাবধানে তা পরিব্রাজককপে গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।

পত্রসাহিত্য বলে এই গ্রন্থের রীতি অত্যন্ত ঘরোয়া এবং সাবলীল। ঘরোয়া পরিবেশে যেমন সুপরিকল্পিত কোনো চিন্তা থাকেনা, এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে সহজেই যাতায়াত চলে, পরিব্রাজকেও সেই একই প্রবণতা দেখা যায়। জাহাজের বর্ণনা, সহযাত্রীদের কথা, যাত্রাপথের বিভিন্ন বন্দরের ইতিহাস, হাঙ্গর ধরার বর্ণনা, ইউরোপের বিভিন্ন দেশের ইতিহাস, আচাব আচবণ ও ধর্ম সবকিছুই তিনি নির্বিচারে এই পত্রগুলির অন্তর্ভুক্ত করেছেন। সন্ন্যাসী হলেও তিনি পরিবেশ ও তাঁর খুঁটিনাটি সম্পর্কে যে সচেতন ছিলেন, তার পরিচয় এ গ্রন্থে পাওয়া যায়। কখনো তিনি গুরুগম্ভীর আলোচনায় মেতে উঠেছেন, আবার তারই মধ্যে কোথাও কোথাও তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতো হাল্কা রসিকতা করেছেন। বাংলাদেশের প্রকৃতি বা গঙ্গানদীর বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি তাঁর দেশপ্রেমের আবেগকে রুদ্ধ রাখতে পারেন নি। বিভিন্ন দেশের অতীত ও বর্তমান ধর্ম, সমাজ, রাষ্ট্র, শিল্প, দর্শন ইত্যাদি সবকিছু সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বা প্রসঙ্গ তুলতে গিয়ে তাঁর প্রগাঢ় ও ব্যাপক পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রকাশ করেছেন। এই সমস্ত আলোচনার মধ্যে তাঁর বস্তুনিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক মনের পরিচয় পাই। তিনি কোনো ধর্ম বা তত্ত্বকে শ্রেষ্ঠ

প্রতিপাদন করবার চেষ্টা আদৌ করেন নি, বরং তিনি লক্ষ্য করেছেন যে, সব দেশেরই ধর্মীয়, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের মধ্যে—সব দেশের মানুষের মধ্যে একটা সাধারণ ঐক্য আছে। অতি সাধারণ মানুষ যারা, তাদের অবজ্ঞা করেই বিভিন্ন জাতির অবনতি, আবার তাদের জাতীয় উন্নতির মূল এই, এই অতি সাধারণ মানুষদের প্রতি মর্যাদা।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জাতির তুলনামূলক আলোচনা। এই মৌলিক রচনাটি উদ্বোধন পত্রিকায় ২য় ও ৩য় বর্ষে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। ইংরেজ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য-জাতির আগমনের ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে যে ভাববিপ্লব জাগে, তাতে আধুনিক জীবন-ভাবনার জন্ম হয়। জাতীয় জীবনের সর্বস্তরে পাশ্চাত্য মূল্যবোধ বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে। প্রভাবের প্রথম স্তরকে বলা যেতে পারে মুগ্ধতার পর্ব। এ সময়ে মোহগ্রস্ত হয়ে অনেকেই পাশ্চাত্য রীতিনীতির অন্ধ অনুকরণে প্রবৃত্ত হন। ফলে এঁরা স্বদেশের সবকিছুকে তুচ্ছ ও ঘৃণা করতে শিখেছিলেন। আবার এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ রক্ষণশীল দল এ দেশীয় সবকিছু রীতিনীতিকে অন্ধ ভাবে আঁকড়ে ধরতে চেষ্টা করলেন! তাঁদের মতে বিদেশী যা কিছু আছে, সবই বর্জনীয়। ক্রমে ক্রমে আমাদের মধ্যে জেগেছে স্বাজাত্য বোধ। রক্ষণশীল দল যেমন সংস্কৃতির গতিকে স্বীকৃতি দিলেন, তেমনি প্রগতিশীল অনুকারক দল পাশ্চাত্য দেশপ্রেম নামক বস্তুটি সম্পর্কেও সচেতন হলেন। এই স্বাজাত্যবোধকে বলা চলে দ্বিতীয় স্তর। তৃতীয় স্তরকে বলা চলে সমন্বয় পন্থার স্তর। এযুগে অনেক মনীষী নিরপেক্ষ এবং যুক্তিবাদী দৃষ্টি নিয়ে উভয় সভ্যতাকে নিরীক্ষণ করেছেন এবং উভয় সভ্যতারই গ্রহণীয় এবং বর্জনীয় দিকগুলি ইঙ্গিত করেছেন। স্বামিজী এই তৃতীয় স্তরে অবস্থান করেছেন। তিনি নিরপেক্ষ ভাবে উভয় সভ্যতাকে পর্যবেক্ষণ করে গ্রহণীয় ও বর্জনীয় দিকগুলি নির্ধারণ

করেন। জাতীয় আন্দোলনকে সঠিক পথে পরিচালনের জন্যেই এই নিরপেক্ষ দৃষ্টি গ্রহণ করেছেন। দেশ প্রেম তাই তাঁর মধ্যে ছিলো, কিন্তু শ্রেষ্ঠম্মন্যতা তাঁর মধ্যে ছিলো না। বলা বাহুল্য হীনম্মন্যতাও ছিলো না।

ভাব্‌বার কথা নয়টি প্রবন্ধের সঙ্কলন গ্রন্থ। 'ঈশা অনুসরণ' নামে প্রবন্ধটি কেম্পিসের Imitation of christ গ্রন্থের অসমাপ্ত অনুবাদ। 'সাহিত্য কল্পদ্রুম' নামে মাসিক পত্রিকায় ১২৯৬ সালে ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ পর্যন্ত অনুবাদ তিনি প্রকাশ করেছেন। গ্রন্থটি তাঁর অশান্তজীবনে শান্তির পথ প্রদর্শক এবং এটি তাঁর অত্যন্ত প্রিয় গ্রন্থ ছিলো। অনেক সময় তিনি এর অনেক অংশ শিষ্যদের কাছে ব্যাখ্যা করে শুনিয়েছেন। স্বামিজী রামকৃষ্ণ সম্পর্কে তাঁর ধারণাকে প্রকাশ করেছেন 'হিন্দুধর্ম ও শ্রীরামকৃষ্ণ' এবং 'রামকৃষ্ণ ও তাঁহার উক্তি' প্রবন্ধে। প্রথমটিতে হিন্দুধর্মের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের আর্বিভাবের গুরুত্ব বোঝানো হয়েছে! সনাতন ধর্মকে লোকহিতের মধ্যে দিয়ে জীবন্তভাবে প্রকাশ করতে নিজেকে শ্রীশ্রীঠাকুর আবির্ভূত করেছেন। দ্বিতীয় প্রবন্ধটি প্রথমটির চেয়ে দীর্ঘ এবং মোক্ষমূলরের The Life and Sayings of Ramakrishna গ্রন্থের সমালোচনা। এখানে স্বামিজীর সমালোচনা পদ্ধতি বিস্ময়কর। রামকৃষ্ণ অতি সাধারণ লৌকিক ভাষায় চূড়ান্ত দার্শনিক ও ধর্মীয় তত্ত্ব প্রকাশ করতেন। নীতিশিক্ষাও তিনি সহজ ভাষায় প্রদান করতেন। স্বামিজীর মতে, এই বৈশিষ্ট্যটি শ্রেষ্ঠ ধর্মগুরুদের মধ্যেই থাকে। প্যারিসে থাকা কালীন একটি প্রদর্শনীতে প্রদত্ত বক্তৃতার বিবরণ "পারি প্রদর্শনী"। এতে ধর্ম ও ইতিহাস শুধু নয়, শিল্প বিষয়ক জ্ঞানও সুন্দর ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। 'বর্তমান সমস্যা' প্রবন্ধটি বর্তমান কালের বীর্যহীন-তার সমস্যা। জ্ঞানার্জনের গুরুত্বকে স্বামিজী প্রকাশ করেছেন 'জ্ঞানার্জন' প্রবন্ধে। 'ভাব্‌বার কথা' প্রবন্ধটি টুক্‌রো টুক্‌রো কিছু

উপদেশের সঙ্কলন। এক একটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গল্পের মধ্যে দিয়ে তা প্রকাশ পেয়েছে। 'ভাব্‌বার কথা' গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ 'বাঙ্গালা ভাষা।' ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৩০শে ফেব্রুয়ারী স্বামিজী আমেরিকা থেকে যে পত্র উদ্বোধন সম্পাদককে লেখেন, 'বাঙ্গালা ভাষা' তা থেকেই উদ্ধৃত। ভাষার আদর্শ নিয়ে লেখা এই সংক্ষিপ্ত অথচ মূল্যবান রচনাটি তাঁর নিজের ভাষাদর্শকে বোঝবার সূত্র বিশেষ। তাঁর মতে ভাষা ও বিষয়বস্তুর সঙ্গে সম্পর্ক আপেক্ষিক। যেমন বিষয়, ভাষা তদনুযায়ী হবে। প্রয়োজন হলে ভাবকে সার্থক ভাবে প্রকাশ করতে গুরুচণ্ডালী ভাষা প্রয়োগেও দোষ নেই। স্বামিজীর এই আদর্শ সবুজপত্রে পরে অনুসৃত হয়েছে।

বর্তমান ভারত একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ। এটি প্রবন্ধাকারে পাক্ষিক উদ্বোধনে প্রকাশিত হয় এবং পরে সারদানন্দের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়। 'বর্তমান ভারত'-এর ভাষা রীতি তাঁর অন্যান্য বইগুলি থেকে পৃথক। এতে স্বামিজী সাধু ক্রিয়াপদ, সমাসবদ্ধ পদ ও তৎসম শব্দ ব্যবহার করেছেন। স্বভাবসিদ্ধ রঙ্গ-রসিকতাও এখানে অনুপস্থিত। প্রকৃত পক্ষে বিষয়বস্তুর প্রয়োজনেই ভাষারীতির এই বৈশিষ্ট্য তিনি রক্ষা করেছেন। এই গ্রন্থটির ভাষাগত জটিলতা ও দুর্বোধ্যতার অপবাদ স্খালন করে সারদানন্দ মন্তব্য করেছেন,—'আমরা উহাতে ভাব ও ভাষার অদ্ভুত সামঞ্জস্য দেখিয়া মোহিত হইয়াছি। বঙ্গ ভাষা যে অল্লায়তনে অত অধিক ভাবরাশি প্রকাশে সমর্থ, ইহা আমরা পূর্বে আর কোথাও দেখি নাই। পদলালিত্যও অনেক স্থানে বিশেষ বিকশিত। অনাবশ্যকীয় শব্দনিচয়ের এতই অভাব যে, বোধহয় যেন লেখক প্রত্যেক শব্দের ভাব পরিমাণ করিয়া আবশ্যকমত প্রয়োগ করিয়াছেন।' গ্রন্থটির ছত্রে ছত্রে তাঁর পৌরুষ, চারিত্রিক দৃঢ়তা ও মহৎ আদর্শ প্রকাশিত হয়েছে। এতে বৈদিক যুগ থেকে ইংরেজ যুগ পর্যন্ত ভারতের সুদীর্ঘ ইতিহাসের বিবর্তনের ধারাটি বোঝানো

হয়েছে। এ ইতিহাস বস্তুর ইতিহাস নয়, ভাবের ইতিহাস। ভারতবর্ষ সম্পর্কে স্বামিজীর সামগ্রিক দৃষ্টির পূর্ণতম প্রকাশ এই গ্রন্থে লক্ষ্য করা যায়। রবীন্দ্রনাথের প্রবন্ধ 'লড়াইয়ের মূল' এবং ভারতবর্ষ সম্পর্কিত অন্যান্য কিছু প্রবন্ধ অতি সহজেই বিবেকানন্দের এই গ্রন্থটির কথা মনে করিয়ে দেয়। স্বামিজীর রচনা অবশ্য অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও বস্তুবাদী। বৈদিক যুগে পুরোহিত-প্রাধান্যের কারণ তিনি প্রদর্শন করেছেন; ইতিহাসের ধারায় জন সাধারণের কথাও তিনি বড় করে দেখিয়েছেন; ব্রাহ্মণ্য, ক্ষাত্র, বৈশ্য সভ্যতার মূল পার্থক্য তিনি সংক্ষেপে সুন্দর ভাবে আলোচনা করেছেন। তারপর জ্ঞাত ইতিহাসের ভিত্তিতে অনাগত ভবিষ্যৎ ইতিহাসের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ইতিহাসে এদেশে ও বিদেশে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের রাজত্ব শেষ হয়েছে। সাধারণ ভাবেই বৈশ্যের পরে আসবে শূদ্র শক্তির জাগরণ, তাদের রাজত্ব। অতীত ও ভবিষ্যতের কথা শেষ করে তিনি আবার বর্তমানের মধ্যে ফিরে এসেছেন। তিনি সংস্কারশূন্য ভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতা দ্বারা প্রদত্ত ভালো জিনিসগুলি গ্রহণ করতে বলেছেন, আবার অন্ধ অনুকরণের সমালোচনাও তিনি একই ভাবে করেছেন। তাঁর মতে স্বচ্ছ যুক্তিবোধ নিয়ে পাশ্চাত্যের গ্রহণীয় ও বর্জনীয় বিষয়গুলি নির্ধারিত করতে হবে। 'এ ভারত ভুলিও না' নামে বিখ্যাত অনুচ্ছেদটি এই গ্রন্থেরই উপসংহার। বর্তমান ভারতের সমস্যাগুলিকে তুলে ধরে সেগুলি দূরীকরণ এবং ভ্রাতৃত্ববোধের মধ্যে দিয়ে জাতীয় উন্নতি সর্বোপরি আত্মিক উন্নতি সম্পাদন করতে তিনি ভারতবাসীকে আহ্বান জানিয়েছেন।

পরিব্রাজক, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য, ভাব্‌বার কথা ও বর্তমান ভারত —স্বামিজীর বাংলা গ্রন্থ এই চারটি। এ ছাড়াও আছে মূল্যবান পত্রাবলী এবং কিছু কবিতা। স্বামিজীর মধ্যে ব্যক্তিগত উপাদান হয়তো আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত উপাদানকে অতিবর্তন করে নৈর্ব্যক্তিক

উপাদান অনেকক্ষেত্রেই প্রাধান্যলাভ করেছে। উদ্বোধন কর্তৃক প্রকাশিত আধুনিক সংস্করণে বিবেকানন্দের বাংলা পত্র সংখ্যা মোট ৫৫২টি। এগুলির রচনাকাল ১৮৮৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১৯০২ খৃষ্টাব্দ। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দের পূর্বে লেখা পত্রগুলি সাধু ভাষায় এবং পরের গুলি চলিত ভাষায় লেখা। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে তিনি ব্যতিক্রমও ঘটিয়েছেন। শেষের দিকের পত্রগুলিতে তিনি প্রচুর ইংরিজী শব্দ প্রয়োগ করেছেন। অধিকাংশ পত্রেই অভিনিবেশের অভাব এবং ব্যস্ততা এগুলিকে কর্মীর পত্র রূপেই পরিচিত করে। এগুলির বিষয় বস্তুতে বাস্তবিকই কর্মযোগী বিবেকানন্দের পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে। মঠ ও সংগঠনের বিভিন্ন সমস্যা ও সমাধান নিয়ে অধিকাংশ পত্র রচিত। পত্রগুলিতে তাঁর প্রবন্ধের বক্তব্যগুলিই ভিন্নরূপে প্রকাশিত। কখনো তিনি প্রচলিত আচার ও কুসংস্কারকে তীব্র ভাবে আঘাত করছেন, আবার কখনো বা নারীজাতির মর্যাদাকে তুলে ধরবার জন্য আবেগময় ভাষায় তিনি তাঁর বক্তব্য প্রকাশ করেছেন। কোথাও চিন্তা, কোথাও অনুভূতি, কোথাও গাম্ভীর্য, কোথাও লঘুতা, বিবেক ব্যক্তিত্বের এই বৈচিত্র্যগুলি পত্রাবলীতে দেখা যায়। তবে সর্বত্র একটি সুরই বার বার ভেসে আসে, তা হচ্ছে মানবপ্রেমের, স্বজাতিপ্রেমের সুর।

বিবেকানন্দের ইংরিজী ও সংস্কৃত কবিতার মতো কিছু বাংলা কবিতাও আছে। এগুলির বিষয়বস্তু ধর্মীয়। ধর্মীয় অনুভূতি, দিব্য উপলব্ধি, ধর্মবিশ্বাসের সঙ্কট এবং তা থেকে পরিত্রাণ লাভের ব্যাকুলতা ইত্যাদি কবিতাগুলির মধ্যে দেখা যায়। তবে এগুলির ত্রুটি এই যে, রূপকল্প ও গীতিরসের অভাবে ভাবকে মূর্তি না দিয়ে এগুলি তত্ত্বের বাহন এবং ভাষণ প্রধান হয়েছে। তত্ত্বের গতি প্রকটতার দিকে এবং রসের গতি ব্যঞ্জনার দিকে। কবিতাগুলির তত্ত্বপ্রাধান্য রসের হানি ঘটিয়েছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে উপলব্ধির সততা এবং আবেগের চাপ কবিতার আস্বাদন সৃষ্টি করেছেন। উপনিষদের ভাবনির্ভর ব্রাহ্মসঙ্গীতের

অনুকরণে লেখা 'নাহি সূর্য, নাহি জ্যোতিঃ' সঙ্গীতটি উপনিষদের 'ন তত্র সূর্যো ভাতি, ন চন্দ্র তারকং'···ইত্যাদি শ্লোকটির কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রকৃতি বর্ণনার মধ্যে দিয়ে ঈশ্বর ও বিশ্ব-উপলব্ধির প্রকাশ ঘটেছে রূপকধর্মী কবিতা—গাই গীত শুনাতে তোমায়'—এর মধ্যে। কবিতাটির মধ্যে Cosmic Imagination-এর সার্থক অভিব্যক্তি দেখা যায়, কয়েকটি ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের কবিতাংশও স্মরণ করিয়ে দেয়। বিবেকানন্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা—'সখার প্রতি' এবং 'নাচুক তাহাতে শ্যামা।' প্রথম কবিতাটিতে পার্থিব দুঃখ শোক, সাধনমার্গের বিভিন্ন বাধাবিপত্তির বর্ণনা ইত্যাদি প্রকাশ পেয়েছে। দ্বিতীয় কবিতায় তাঁর জীবনদর্শন, কল্পনা-ঐশ্বর্য, বর্ণনা নৈপুণ্য ইত্যাদির একত্র উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। কবিতাটিতে স্বামিজী বিশ্বজগতের মাধুর্যময় ও নিষ্ঠুর দুটি রূপই অঙ্কন করেছেন। মায়ার বন্ধন এবং মুক্তির জন্যে ক্রমাগত সংগ্রামের কথাও কবিতায় যুদ্ধের রূপকের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে। তাঁর একটি ইংরিজী কবিতা—'Kali the Mother'-এর ভাবকল্পনার সঙ্গে এর সাদৃশ্য আছে। স্বামিজী রচিত 'সাগরবক্ষে' কবিতাটি বিশুদ্ধ প্রকৃতি কবিতা। কবিতাটির মধ্যে কিছু স্বদেশপ্রেমের ইঙ্গিতও আছে।

পরিমাণ দিয়ে সাহিত্যের উৎকর্ষ বিচার চলে না। তবে বিবেকানন্দের সাহিত্যিক সম্ভাবনাও যথেষ্ট ছিলো। এই কর্মীপুরুষটি সাহিত্য ক্ষেত্রে অভিনিবেশের সুযোগ পেলে বাংলা সাহিত্য সমৃদ্ধতর হতো। তাঁর চিন্তা ও বক্তব্যের স্বচ্ছতা যা সমকালীন প্রাবন্ধিকদের মধ্যে অনুপস্থিত ছিলো, তা হয়তো প্রবন্ধ ধারাকে আরো সমৃদ্ধ করে তুলতো। তাঁর মধ্যে পাণ্ডিত্য প্রকাশের মধ্যে দিয়ে আত্মপ্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা আদৌ ছিলো না। বরং লোকশিক্ষার ব্রত গ্রহণ করায় প্রবন্ধরচনায় তাঁর মানসিকতা ছিলো ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তুলনায় দেখা যায়, ভাষার শিল্পগুণ, চিন্তার পারম্পর্য ইত্যাদির দিক

থেকে স্বামিজীর রচনার চেয়ে রবীন্দ্রনাথের রচনা কিছু উন্নত, কিন্তু অন্য কয়েকটি দিকও আছে। সহজ প্রত্যক্ষ শব্দ নির্বাচনের ক্ষেত্রে স্বামিজীর মধ্যে রবীন্দ্রনাথের মতো দ্বিধাগ্রস্ততা নেই। তাছাড়া রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় ভাবজালে জড়িয়ে পড়ে বক্তব্যকে আরো দুর্বোধ্য করে তুলেছেন। কিন্তু স্বামিজী সুস্পষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করে জাতিকে সক্রিয় ভাবে উদ্বোধন করেছেন, এবং তাই তাঁর বক্তব্যের একটি মাত্র উদ্দেশ্য অর্থাৎ পাঠকের মনে স্পষ্ট ভাবে পৌঁছে দেবার আকাঙ্ক্ষাকেই তিনি মূল্য দিয়েছেন। বক্তব্যকে সুন্দর ভাবে প্রকাশ করবার ইচ্ছা প্রাধান্য লাভ করেনি এবং সে ইচ্ছা রূপায়ণের সময়েরও অভাব ছিলো তাঁর। তবু তাঁর ধর্ম সমাজ রাষ্ট্র দর্শন ইতিহাস শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কিত জ্ঞান, তাঁর আদর্শবাদী ভাবুকতা যা—মানুষ ও জাতিকে কেন্দ্র করে প্রকাশ পেয়েছে, তাঁর বক্তব্যের স্পষ্টতা ও সমাধান পথের স্পষ্ট ইঙ্গিত ইত্যাদি তাঁর সাহিত্যকে সমকালীন অন্যান্য সাহিত্য থেকে বিশিষ্ট করেছে।

১২

বিবেক-মানস

প্রত্যেক সৃষ্টির অন্তরালে একটি মানস সক্রিয়। বিবেকানন্দের কর্মসাধনা, সাহিত্য সাধনা ইত্যাদির অন্তরালেও বিবেক মানস সক্রিয়। বিবেকানন্দের কর্মধারা পর্যবেক্ষণ করলে তাঁর মানসপ্রকৃতি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিবেক মানসে প্রথম লক্ষিতব্য বিষয় তাঁর সংগঠন শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়। বাল্যকালে মেট্রোপলিটান ইন্‌স্টিটিউশানের ছাত্ররূপে তাঁর যে দল গঠনের ক্ষমতা দেখা যায়, পরিণত-জীবনে সেই ক্ষমতাই মিশনের কর্ম-পদ্ধতির মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে।

পারিবারিক সংস্কার তাঁকে সন্ন্যাসী সম্পর্কে সচেতন করেছে এবং এই জাতীয় জীবন সম্পর্কে রহস্যদৃষ্টি পরবর্তীকালে সন্ন্যাসের প্রতি তাঁকে সহজেই আকৃষ্ট করেছে। জীবজন্তুর প্রতি আকর্ষণ পরবর্তী কালে সার্বজনীন প্রেমধর্মের ওপরে সেই সন্ন্যাসকে প্রতিষ্ঠিত করেছে।

বিবেকানন্দের একাগ্রতা ও স্মৃতিশক্তি বাল্যকাল থেকেই লক্ষ্য করা যায়। এই একাগ্রতা তাঁর পদ্ধতির রূপায়ণে অবিচল করেছে, চিন্তাশক্তিকে সংহত করেছে, অন্যদিকে স্মৃতিশক্তি ঐতিহ্য সম্পর্কে সচেতনতা এনে দিয়েছে, গ্রন্থচেতনা এবং পারিপার্শ্বিক অতীত ও সমকালীন জ্ঞানচেতনা এনে দিয়েছে। বাল্যকালে দেশভ্রমণের সুযোগে তাঁর মনে সৌন্দর্যবোধ, দেশপ্রেম এবং দিব্যানুভূতি চেতনায় স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বাল্যকালে জননীর কাছে পৌরাণিক উপাখ্যান

শ্রবণ এবং পিতার কাছে প্রগতিশীল নীতিবোধের দীক্ষা গ্রহণে তাঁর মধ্যে একদিকে সংস্কার এবং অন্যদিকে উদার দৃষ্টির সহাবস্থান ঘটেছে। তাঁর মন সাহিত্য ও দর্শনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে পিতার প্রভাবে।

ব্যায়ামের প্রতি স্বামিজীর দৃষ্টি ছিলো যৌবনকাল থেকেই। এই বোধ তাঁকে জীবনের ক্ষেত্রে আত্মপ্রত্যয়ী, ব্যাবহারিক এবং মানসিক দিক থেকে বলিষ্ঠ করে তুলেছে। জীবনে কষ্ট-সহিষ্ণুতার মূলেও এই বোধ কিছু কার্যকর। তাঁর বক্তব্যকে তিনি ঋজুভাবে যেমন প্রকাশ করতে পারতেন, তাঁর উচ্চারণ ও স্বরের আনুকুল্যও তার সঙ্গে সংযুক্ত হওয়ায় বক্তব্য প্রকাশের ক্ষেত্রে তাঁর সাফল্য এসেছে এবং আত্মপ্রত্যয়ও বর্ধিত হয়েছে।

তাঁর বন্ধুবাৎসল্য তাঁর শৈশবকাল থেকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই বন্ধুবাৎসল্য থেকেই তিনি ব্রাহ্মণ ভারতবাসী থেকে চণ্ডাল ভারতবাসী পর্যন্ত সকলকেই নিজের রক্ত, নিজের ভাই বলে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

স্বামিজীর ব্যাবহারিকজ্ঞান, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা, প্রবল আত্মনিষ্ঠা, জ্ঞান-অর্জনের প্রবল আগ্রহ, সামাজিকতা, সমস্যার ক্ষেত্রে আত্মপ্রত্যয়ী লীলাচপলতা ও আশীর্বাদ, আবার অন্যদিকে ভাবালুতা ও চিন্তাশীলতা, আত্মবিস্মৃতিময় একাগ্রতা সংস্কার ও শ্রদ্ধাবোধ সব কিছুই একত্র উপস্থিত ছিলো। একদিকে তাঁর ছিলো কাব্য, ইতিহাস, দর্শনের প্রতি আকর্ষণ, আবার তাঁকেই দেখা যায় গণিত কিংবা গণিত জ্যোতিষের প্রতি আকৃষ্ট। ডেকার্টের আত্মসর্বস্ববাদ, হিউম বা বেনের নাস্তিক্যবাদ, ডারউইনের অভিব্যক্তিবাদ, স্পেন্সারের অব্যক্তবাদ—সব কিছুই তাঁর চিত্তকে আন্দোলিত করেছে এবং এগুলির মধ্যে তিনি পথ হারিয়েছেন। আন্দোলন থেকেই বোঝা যায়, তার মানসিক প্রবণতার বিভিন্ন দিকগুলি থেকেই তিনি এগুলি সমর্থন করতে

চেয়েছেন, তবে Sentiment-এর মধ্যে অবশেষে আশ্রয় খুঁজেছেন। এই কারণেই তাঁকে শেলীর কবিতা পড়তে দেখা যায়। অবশ্য হেগেলের দর্শন, ফরাসী বিপ্লব-দর্শন ইত্যাদিও তাঁর মনোভাবের মধ্যে একটি স্থিতি আন্‌তে সহায়তা করেছে।

সঙ্গীতশিল্পে, অভিনয়-শিল্পে কিংবা নৃত্যশিল্পে দক্ষতা তাঁর সামাজিক ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে আত্মসচেতনতা ও আত্মপ্রত্যয়কে জাগ্রত করেছে। তবে অভিনয়ে তাঁর যতোই দক্ষতা থাকুক, লক্ষ্যের চেয়ে উপলক্ষ্যের প্রাধান্য তিনি মেনে নিতে পারতেন না। তাঁর সত্যবাদিতা, কর্তব্যকর্মে ঋজুতা, নিজের স্পষ্ট রূপটি অপরকে প্রত্যক্ষ করানো—ইত্যাদি তাঁর মধ্যে বিদ্যমান্ ছিলো।

দার্শনিক নিরাসক্তিই হোক, কিংবা জীবনের গতি ব্যাহতির আশঙ্কাই হোক, সংসারধর্মে তাঁকে অনেকটা নিস্পৃহ করে তুলেছিলো। তাঁর আদর্শের সঙ্গে ও মনোধর্মের সঙ্গে আমাদের সমাজের সংসার ধর্মের গতি-প্রকৃতির যথেষ্ট পার্থক্য ছিলো। পরবর্তীকালের আধ্যাত্মিক আকর্ষণের সঙ্গে তা সংযুক্ত হওয়ায় সন্ন্যাস—ধর্মাচরণের ক্ষেত্রে তাঁর কোনো দ্বিধা-দ্বন্দ্ব আসে নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে এবং পিতার প্রগতিশীল চেতনার প্রভাবে প্রভাবিত যুবকের মনোধর্মের সঙ্গে শ্রীরামকৃষ্ণের মতবাদের উদারতা ও মানবধর্মনির্ভরতার কোনো বিরোধ ছিল না। সংগঠন শক্তির প্রয়োজনের যে উপলব্ধি ঊনবিংশ শতাব্দীর জাতীয়তা-বোধের সঙ্গে জড়িত ছিলো, শ্রীরামকৃষ্ণের নির্দেশ ও মতবাদের সঙ্গে তারও কোনো বিরোধ ছিলো না। তাঁর আবেগপ্রবণ চিত্ত সামগ্রিক সংগঠনের মাধ্যমে নির্যাতিত মানুষের দুঃখ নিবারণে অসমর্থ হয়েছে এবং নৈরাশ্যবাদ থেকে তিনি অন্তর্মুখী পদ্ধতির মাধ্যমে উপায় খুঁজতে চেয়েছেন ; কিন্তু অবশেষে পদ্ধতির স্বয়ংসম্পূর্ণতায় সন্দেহ আসে এবং বহির্মুখীন পদ্ধতির সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নেন।

বিবেকানন্দের অন্তরস্থিত রাজসিকতা তাঁকে ভ্রমণবিলাসী করেছে। বিবেকানন্দ তাঁর এই বিলাস সম্পর্কে সচেতন ছিলেন এবং পরে এই বিলাসের সঙ্গে বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ও জনকল্যাণ সংযুক্ত হওয়ায় ভ্রমণ বিলাসই আদর্শ প্রচারে সহায়ক হয়েছে। বিশ্বমানবপ্রকৃতি, বিশ্বসমাজপ্রকৃতি, বিশ্বের আচারবিচার, বিশ্বের জ্ঞানবিজ্ঞান ইত্যাদি সম্পর্কে তাঁর চেতনাবৃদ্ধির কারণ ছিলো ঐ ভ্রমণবিলাস; পরে এই চেতনাই জাতীয় উন্নতিকামিতার ক্ষেত্রে তুলনামূলক বিচার ও পদক্ষেপে সহায়তা করেছে।

বহির্মুখীনতা ও জীবনের কেন্দ্রচ্যুতি তাঁর মনে এনেছে অতৃপ্তি। পাশ্চাত্য-সভ্যতার মধ্যেকার প্রগতিশীলতা তাঁকে মুগ্ধ করলেও বহির্মুখীনতা তাঁকে পীড়া দিয়েছে। তাদের একেশ্বরবাদের কেন্দ্রায়নে আকর্ষণ থাকলেও বিবেক বৈরাগ্যের অভাব, ত্যাগের অনুপস্থিতি তাঁকে অতৃপ্তি দিয়েছে। তাই তিনি বেদান্তবাদের মধ্যেই প্রগতিশীলতা পর্যবেক্ষণ করেছেন এবং তার উপযোগিতা প্রচার করেছেন। বাল্যকালের সাকার-সংস্কার প্রথমে তাঁর মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব এনেছে, কিন্তু পরে সাকারত্ব ও নিরাকারত্বের অভেদ-বোধ এই সংশয় দূরীভূত করেছে ফলে আত্মপ্রত্যয় ও কর্মশক্তি আরও বৃদ্ধি পেয়েছে।

যে বিবেকচিন্তা থেকে জন্ম নিয়েছে বিবেকানন্দের সমগ্র সাহিত্য, সেই চিন্তার উৎস এই বিবেকমানস। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের সর্বত্রই বিবেকানন্দের এই মনোধর্ম পরিদৃশ্যমান্। অনেকে মন্তব্য করে থাকেন, একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রভাব বিবেকানন্দকে যেমন বিকশিত করতে সহায়তা করেছে, আবার তেমনি সেই সম্প্রদায়ের প্রভাবই অনেক ক্ষেত্রে তাঁকে সংস্কারাচ্ছন্ন করে প্রগতিশীল উদার মানবধর্মের সর্বোত্তম বিকাশের পথে অন্তরায় হয়েছে। তাঁদের মতে বিবেকানন্দ যে মানসের অধিকারী ছিলেন, সেই মানসের আরো পরিপূর্ণতা আসতে পারতো। মন্তব্যটি বিবেচনাধীন।

পরিশেষে বলা চলে, বিবেক মানস গত শতাব্দীর রেনেসাঁস জনিত একটি মন এবং বিদ্যাসাগর ও মধুসূদনের মনের মতোই একটি বৈপ্লবিক স্ফুলিঙ্গ।

১৩

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রসঙ্গ সূচী

১। ভূমিকা
২। ধর্ম ও মোক্ষ
৩। স্বধর্ম বা জাতিধর্ম
৪। শরীর ও জাতিতত্ত্ব
৫। পোষাক ও ফ্যাশন
৬। পরিচ্ছন্নতা
৭। আহার ও পানীয়
৮। বেশভূষা
৯। রীতিনীতি
১০। পাশ্চাত্যে শক্তিপূজা
১১। ইউরোপের নব জন্ম
১২। প্যারি ও ফ্রান্স
১৩। পরিণামবাদ
১৪। সমাজের ক্রমবিকাশ
১৫। দেবতা ও অসুর
১৬। দুই জাতির সংঘাত
১৭। তাতার জাতি
১৮। উভয় সভ্যতার তুলনা
১৯। পরিশিষ্ট (স্বামীজীর মৃত্যুর পর তার কাগজপত্রের সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এই অংশ পাওয়া গেছে।)

১৪

বিষয়-নির্যাস

একদিকে সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশে ধনীর গগনস্পর্শী, মর্মর-প্রাসাদ, অন্যদিকে শোচনীয় দুরবস্থা ও অপরিচ্ছন্নতার মধ্যে বিদ্যমান নৈরাশ্য-পীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিদের জীর্ণ কুটীর, এটাই বর্তমান ভারতের বাহ্য চিত্র। অট্টালিকার পাশাপাশি জীর্ণ কুটীর, দেবালয়ের পাশে আবর্জনা, সুসজ্জিতের পাশে কৌপীনধারী, অতি ভোগীর পাশে ক্ষুধার্ত-ম্রিয়মাণ মানুষ—এটাই আমাদের জন্মভূমির বৈশিষ্ট্য।

(অনুচ্ছেদ ১—২)

মহামারী, বিভিন্ন রোগের অবস্থিতি, দুর্ভিক্ষের পুনঃপুনঃ আবির্ভাব, অস্থিচর্মসার পশুবৎ মানুষ, এই শ্মশানের পাশে মুক্তিকামী যোগী সন্ন্যাসী—বিদেশী পর্যটকের দৃষ্টিতে এটাই ভারতবর্ষ। বহু শতাব্দীর দাসত্বে আজ ভারতবাসী মনুষ্যত্ব হারিয়ে ফেলেছে। সর্বত্রই ঈর্ষা, পরশ্রীকাতরতা, পারস্পরিক পীড়ন, মেরুদণ্ডহীনতা—ইংরেজ রাজ-পুরুষের চোখে এটাই ভারতবাসীর সম্বল। আবার ভারতবাসীরা পাশ্চাত্য ব্যক্তিদের দেখে—হিংস্র পশুস্বভাব, কামোন্মত্ত, সুরাসেবী, আচারহীন, জড় পন্থী, পরদেশ লুণ্ঠনকারী জীব ইহকাল সর্বস্ব অসুর রূপে।

(অনুচ্ছেদ ৩—৫)

ইউরোপীয়রা তাদের পরিচ্ছন্ন অঞ্চলের সঙ্গে আমাদের অপরিচ্ছন্ন বসতির তুলনা করে। যারা তাদের অধীনে কাজ করে, ওদের মতে তারাই ভারতবাসী। থাকতে পারে আমাদের দারিদ্র্য ও অপরিচ্ছন্নতা

কিন্তু ভালোও যে কিছু থাকা সম্ভব, ইউরোপীয়রা তা বিশ্বাস করতে চায় না। আমরাও তাদের শৌচহীন, স্ত্রৈণ ও সুরাপায়ী বলেই জানি, তাদের ভালো কিছু দেখতে চাই নে। এই দুই দৃষ্টিই বাইরের দৃষ্টি। কিছু সত্য থাকলেও বাইরে ও ভেতরে পার্থক্য ধরা পড়ে না। ওদের আমরা বলি 'ম্লেচ্ছ', আর ওরা আমাদের বলে 'নেটিভ' বা 'কালাদাস'। (অনুচ্ছেদ ৬—৯)

বিভিন্ন জাতির বিভিন্ন প্রকার জীবনোদ্দেশ্য ও জাতীয় ভাব রয়েছে। বাইরের মানুষ সেই জাতীয়-ভাবের বাইরের প্রকাশ মাত্র। সংসারের স্থিতির জন্যে মূল ভাবটি প্রয়োজন। ভারতবর্ষের জাতীয় ভাবটি জগতের জন্যে এখনো আবশ্যক বলেই ভারতবাসী এতো দুঃখ ও পীড়ন সহ্য করেও বেঁচে আছে। ইউরোপীয়দেরও জাতীয় ভাবটি আবশ্যক। এবং জাতি হচ্ছে ব্যক্তির সমিষ্টিমাত্র। ভারতবর্ষ এখনো যে ধ্বংস হতে পারে নি, তার কারণ তার মধ্যে কোথাও একটি বল আছে। অতএব ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষকে যতো দুর্বল মনে করে, ততোটা দুর্বল সে নয়। ভারতকে উদ্ধার করবার জন্যে তাই তাদের সহায়তার কোনো প্রয়োজন নেই। এদেশে যীশু বা জিহোবার কোনো প্রয়োজন নেই—এদেশে সেই বুড়ো শিব, মুরলীধর শ্রীকৃষ্ণ ও কালী মাতার রাজত্ব চলে আসছে, এবং চিরকাল তাঁদের রাজত্বই চলবে। আমাদের দেশের আত্মপ্রত্যয়হীন কিছু মানুষ নিজেদের সব কিছুকেই খারাপ ভাবে এবং সাহেবদের কাছে উদ্ধারের জন্যে প্রার্থনা জানায়। তবে অবশ্য দেশের সব মানুষ একরকম নয়। (অনুচ্ছেদ ১০)

সব জাতিরই সব রকম গুণই আছে। তবে কোনোটি অল্প, কোনোটি বেশি। আমরা চাই মুক্তি, পাশ্চাত্যদেশের লোকেরা চায় ধর্ম। ধর্ম মানুষকে সর্বদা ইহজীবনে ও পারলৌকিক জীবনে সুখের সন্ধানে নিয়োজিত করছে। আর মোক্ষের শিক্ষা, দাসত্ব ছাড়া কিছু নয়। কারণ সবই প্রকৃতির অধীন। সর্বপ্রকার বন্ধনের বাইরে

যেতে হবে, তবে প্রাকৃতিক দাসত্ব ঘুচবে। মোক্ষমার্গ বা মুক্ত পুরুষের অস্তিত্ব ভারতবর্ষেই আছে, অন্যত্র নেই। অবশ্য পরে অন্যত্রও হবে। প্রাচীনকালে এদেশে ধর্ম ও মোক্ষের সমন্বয় ছিলো। বৌদ্ধযুগের পরে ধর্ম অবহেলিত হয়ে মোক্ষমার্গই প্রধান হলো। বর্তমানে দেশের যে দুর্গতির প্রসঙ্গ উঠছে, তার মূলে রয়েছে ধর্মের প্রভাব। দেশের সকলে মোক্ষ-ধর্ম অনুশীলন করলে অবশ্য শুভ, কিন্তু তা সম্ভব নয়। ভোগ না হলে ত্যাগ হয়না। বৌদ্ধযুগে মোক্ষমার্গের একাধিপত্যে দেশের সর্বনাশ ঘটতে বসেছিলো। দেশের সকলের জন্য একই বিধান হতে পারেনা। তাহলে দেশে শুধু সাধুরই বসতি হতো। অন্যান্য বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ও একই বিধান দিয়েছিলো তাও ছিলো ভুল। জাতি ব্যক্তি ইত্যাদি প্রকৃতিভেদে ব্যবহার, শিক্ষা, নিয়ম—সবই পৃথক, বলপ্রয়োগে এক করতে গেলেই অনর্থ। গৃহস্থের ওপরে মুক্তিসাধনার নির্দেশে অবিচার করা হয়। সেটাই ছিলো বৌদ্ধধর্মের ভুল। হিন্দুশাস্ত্রের নির্দেশ—ধর্মের চেয়ে মোক্ষ বড়ো হলেও আগে ধর্মটি করা প্রয়োজন। পূর্বে ধর্ম পালন না করলে গৃহস্থের পক্ষে মোক্ষসাধনা দুঃসাধ্য।

(অনুচ্ছেদ ১১—১৪)

ধর্ম হচ্ছে কর্মমূলক। কর্মশীলতাই তাই ধার্মিকের লক্ষণ। বহু ব্যক্তি হরিনাম ও জপ করে কিছুই লাভ করতে পারেননি। কারণ যাঁরা তা করেছেন তাঁরা কর্মের মাধ্যমে প্রথমে চিত্তশুদ্ধি ঘটান নি। কর্মসাধকই ধার্মিক এবং ধার্মিকের কৃত হরিনাম বা জপ সার্থক। প্রত্যেক জীব শক্তিপ্রকাশের এক একটি কেন্দ্র—পূর্বের কর্মফলে যে শক্তি সঞ্চিত হয়ে আছে, সে তা নিয়ে জন্মেছে। কর্মরূপে সে শক্তি প্রকাশ না পেলে কে স্থির থাকবে? যতোক্ষণ সে অস্থির, ততোক্ষণ তার ভোগ কেউ ঘোচাতে পারে না। দুঃখভোগ বা কু-কর্মের চেয়ে সুখভোগ বা সুকর্ম অবশ্যই ভালো। অবশ্য 'ভালো' মুক্তিসাধকের কাছে একরকম, ধর্মসাধকের কাছে একরকম।

কিছু না করার চেয়ে ভালোমন্দ মেশানো কর্ম করা ভালো। মানুষেরই মধ্যে সৎ অসৎ দুইই আছে। সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণত্রয় মানুষের মধ্যে থাকলেও একএকটি মানুষে এক একটি গুণের প্রাধান্য এবং তাদের আচার আচরণে তা প্রকাশ পায়। সত্ত্বপ্রধান মানুষ সর্বজন পূজ্য, আপনা থেকেই সকলে তাঁর বশীভূত। দুর্বল প্রকৃতির ক্ষীণকণ্ঠ হৃতভাগ্য ব্যক্তি হচ্ছে তমোগুণ-প্রধান। তাদের মধ্যে আছে মৃত্যুর লক্ষণ। অর্জুনের এই অবস্থা হয়েছিলো বলেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাঁকে এতো উপদেশ দিয়েছেন। জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাবে আমাদের মধ্যেও সেই তমোগুণ এসেছে। তাই দেশশুদ্ধ সকলে হরিনাম করেও হরির কৃপা পায় না। নির্বোধের কথা যেখানে মানুষই শুনতে চায় না, সেখানে ভগবান যে শুনবেন না তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। অতএব ক্লীবত্ব ত্যাগ করে জাগ্রত ও উত্থিত হওয়াই আমাদের উদ্ধারের পথ। (অনুচ্ছেদ ১৫—১৭)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের দিকে চাইলে এক অদ্ভুত জিনিস নজরে আসে। প্রাচ্যজাতি যীশুর এবং পাশ্চাত্যজাতি কৃষ্ণের আদর্শ অনুসরণ করছে। যীশুর আদর্শে চললে পাশ্চাত্যজাতি শত্রুহীন হয়ে কাজ-কর্ম বন্ধ করে তাঁর পুনরাবির্ভাব পর্যন্ত অপেক্ষা করতো। অন্যদিকে কৃষ্ণের আদর্শে চললে প্রাচ্যজাতি সর্বদা কর্মীরূপে শত্রু নাশ করে দুনিয়া ভোগ করতো। কিন্তু বিপরীত ব্যাপারই ঘটছে। আমরা মৃত্যুভয়ে রুগ্ন অবস্থায় কাল যাপন করছি এবং পাশ্চাত্যজাতি কৃষ্ণের নির্দেশকে কর্মে রূপায়িত করেছে। মোক্ষমার্গের কথা প্রথমে বেদে বলা হয়েছে বুদ্ধ ও যীশু তার থেকেই গ্রহণ করেছেন। তাঁদের ক্ষেত্রে মোক্ষ-মার্গ উপযোগী, কিন্তু যে মানুষ মোক্ষ চায়না, তাদের জন্যে তাঁদের কী বিধান? শুধু বৈদিকধর্মে ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুবর্গের সাধন পদ্ধতি আছে। যীশু গ্রীস রোমের এবং বুদ্ধদেব আমাদের সর্বনাশ করেছেন। প্রোটেস্ট্যান্ট হয়ে ইউরোপ যীশুর ধর্ম ত্যাগ করলো,

আর কুমারিল্ল ভারতবর্ষে চালালেন কর্মমার্গ। শঙ্করাচার্য ও রামানুজ চতুবর্গের সমন্বয় সাধন করে সনাতন বৈদিক মতের পুনঃপ্রবর্তন করলেন। ভারত সর্বনাশের হাত থেকে মুক্তি পেলো, কিন্তু ত্রিশ কোটি লোককে জাগানো কষ্টসাধ্য। (অনুচ্ছেদ—১৮)

বৌদ্ধ এবং বৈদিক ধর্মের উদ্দেশ্য এক হলেও উপায় ভিন্ন। ভারতের অধঃপতনের মূলে এই উপায়হীনতা। উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়—জাতিধর্ম, স্বধর্ম, যা বৈদিক সমাজ ও ধর্মের ভিত্তি। এই জাতিধর্ম বা স্বধর্মই সব দেশের সামাজিক কল্যাণের ও মুক্তির উপায়। তবে সব লোক এর অর্থ একরকম বোঝে না। শাস্ত্র যাকে জাতিধর্ম বলছে, সর্বত্রই তা প্রায় লোপ পেয়েছে। কেমন করে তা ফিরবে সেই চেষ্টার মাধ্যমেই কল্যাণ আসবে।

(অনুচ্ছেদ ১৯—২০)

প্রত্যেক জাতির জাতীয় উদ্দেশ্য অনুযায়ী সামাজিক রীতিনীতি গঠিত হয়ে থাকে। অন্য সব রীতিনীতি বাহুল্য। উক্ত বাহুল্য অংশে আঘাত পড়লে কিছু যায় আসে না; কিন্তু পূর্বোক্ত উদ্দেশ্য মূলক অংশে আঘাত পড়লে জাতীয় মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যথার্থ জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে আঘাত পড়লে তখনই মহাবলে প্রতিঘাত করে। বর্তমানকালের তিনটি জাতির তুলনা করলেই বক্তব্যটির সমর্থন পাওয়া যাবে। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ফরাসী জাতির চরিত্রের মেরুদণ্ড, অন্য সব অত্যাচার সহ্য করলেও তারা স্বাধীনতায় কোনোরকম হস্তক্ষেপ সহ্য করে না। ইংরেজ চরিত্রে ব্যবসাবুদ্ধি ও ন্যায়বিভাগ আসল জিনিস। রাজা কিংবা অভিজাতদের কাছে মাথা নীচু করতে তাদের বাধা নেই, কিন্তু টাকা-পয়সা-সংক্রান্ত বিষয়ে তারা চুলচেরা হিসেব চায়। হিন্দুজাতি পারমার্থিক স্বাধীনতা বা মুক্তিকে তাদের জাতীয় জীবনের উদ্দেশ্য বলে মনে করে। তারা অন্য অত্যাচার যা-ই সহ্য করুক, এইস্থানে তারা অত্যন্ত অসহিষ্ণু।

এটা বুঝতে না পারায় পাঠান বংশের রাজত্ব হয়েছিলো অস্থায়ী। মোগলরা ধর্মে হাত দেয়নি বলে কিছুদিন রাজত্ব করতে পেরেছিলো। তবে ঔরঙ্গজেব ওখানে আঘাত করেই মোগল সাম্রাজ্যের অবসান ঘটালেন। ইংরেজরাও ধর্মে হস্তক্ষেপ না করে নিশ্চিতভাবে রাজত্ব চালাচ্ছিলেন। কিন্তু পাদ্রীদের হস্তক্ষেপে অসহিষ্ণু ভারতবাসী সিপাহী বিপ্লব ঘটিয়েছে। বহুদর্শী ইংরেজ অবশ্য তা বুঝেছে। এক্ষেত্রে ভারতের বৈদিক, জৈন, বৌদ্ধ, অদ্বৈত, বিশিষ্টাদ্বৈত, দ্বৈত ইত্যাদি বিভিন্ন সম্প্রদায় একই প্রবণতা বহণ করে।

(অনুচ্ছেদ ২১—২৫)

ধর্ম হচ্ছে হিন্দুদের প্রাণশক্তি। যেমন অগ্নি স্বরূপে এক হয়েও প্রকাশের ক্ষেত্রে বিভিন্ন, তেমনি এক মহাশক্তি ফরাসীতে রাজনৈতিক স্বাধীনতা, ইংরেজি ব্যবসা-বাণিজ্য, সুবিচার-বিস্তার, এবং হিন্দুতে মুক্তিলাভেচ্ছা ইত্যাদি রূপে প্রকাশ পেয়েছে। এই সব বৈশিষ্ট্যেই এদের জাতীয় চরিত্র দীর্ঘকাল ধরে গঠিত হয়েছে। এরা নিজ বৈশিষ্ট্য ছেড়ে অন্য বৈশিষ্ট্য গ্রহণ করে সুস্থির হতে পারবে না। বলপ্রয়োগে তারা মারা পড়বে। সুতরাং জাতীয় উন্নতির ক্ষেত্রে মূল বৈশিষ্ট্যকে তুচ্ছ করে অন্য বৈশিষ্ট্য-প্রয়োগ করা অল্পদর্শিতার পরিচয়। সুতরাং ভারতবর্ষের ভাব, ভাষা ও প্রাণ ধর্ম; রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি সবকিছু ধর্মের মধ্যে দিয়েই পরিচালিত করা দরকার, নইলে সবই ব্যর্থ হবে। জগতের সর্বত্রই দেখা যায়, কয়েকজন ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন পুরুষ দেশ পরিচালনা করেন, অন্য সকলে গড্ডলিকা প্রবাহে তাঁদের অনুসরণ করে। ভারতবর্ষে শক্তিমান্ পুরুষ তিনিই—যিনি ধর্মে শক্তিমান্, তাঁরাই সমাজকে চালনা করেন, প্রয়োজন হলে রীতিনীতি পরিবর্তন করেন, অন্য সকলে তাঁদের নির্দেশ নীরবে মেনে নেন।

(অনুচ্ছেদ ২৬—২৯)

পাশ্চাত্যদেশে রাজনীতির প্রতিপত্তি। রাজনীতি থেকে

প্রজাদের অবশ্য শিক্ষা হয়, আমরা তা পাইনা। তবে ইউরোপে রাজনীতির নামে প্রতারকরা প্রজাদের শোষণ করছে। বাইরে যাই থাকুক ভেতরকার ব্যাপার থেকে নিরাশ হতে হয়। ক্ষমতাশালী শাসক নিশ্চিন্তে প্রজাশোষণ চালাচ্ছে এবং প্রজাদের সৈন্য বানিয়ে দেশ-দেশান্তরে মরতে পাঠাচ্ছে। জয়ী হলে আবার ধনদৌলত আসছে, আর মরলে প্রজারাই মরছে। এখানে মানুষই আইন করছে, টাকা করছে, যশ অর্জন করছে—এখানেই যতো ত্রুটি। কারণ ঘটছে তার বিপরীত। . (অনুচ্ছেদ ৩০—৩১)

মানুষ হওয়াই একমাত্র পথ। তাহলে অন্যগুলো আপনা থেকেই হবে। আমাদের উচিত, সৎ উদ্দেশ্য, সৎসাহস ও সৎ উপায় অবলম্বন করা। এ-জন্মে জীবনে একটা দাগ রেখে যেতে হবে। নতুবা মানুষ কিসের! আর একটা কথা, আমাদের অন্যজাতের কাছেও শেখার অনেক কিছু আছে। যে বলে আর শেখার কিছু নেই, তার মৃত্যু আসন্ন। অবশ্য শিক্ষণীয় জিনিসগুলি আমাদের ছাঁচে ফেলে নিয়ে শিখতে হবে, আমাদের আসল বাঁচাতে হবে। পাশ্চাত্যজাতির কাছ থেকে শিক্ষণীয় বিষয়গুলিও সেভাবে শিখতে হবে, অন্ধ অনুকরণ করলে চলবে না। (অনুচ্ছেদ ৩২—৩৩)

পূর্বোক্ত ভূমিকা দিয়ে দু-দেশের তুলনা সহজ হবে। দু-দেশেই নেবার অনেক জিনিসই আছে। সেগুলোও আবার বিভিন্ন রকম। মানুষের মধ্যে থাকে তিনটি জিনিস—শরীর, মন, আত্মা। প্রথমে শরীরের বাইরের প্রসঙ্গে আসা যাক। (অনুচ্ছেদ ৩৪—৩৫)

শরীরে শরীরে অনেক ভেদ। বর্ণভেদের কারণ বর্ণ সাঙ্কর্য, অবশ্য প্রাকৃতিক প্রভাবও কিছু আছে। তবে সাদা কালোর আসল কারণ পৈতৃক। অতি শীতল দেশেও কালো আছে, আবার গরমের দেশে ফরসা জাতিও দেখা যায়। (অনুচ্ছেদ ৩৬—৩৭)

হিন্দুদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—এই তিন জাতি এবং

চীন, হূণ, দরদ্, পহ্লব, যবন ও যশ্ এই সকল ভারতের বহিঃস্থিত জাতি—এরাই আর্যজাতি। এদের মধ্যে যবন হচ্ছে গ্রীকদের নাম। যশ্ শব্দে অর্ধসভ্য পার্বত্যজাতি বোঝায়। ইউরোপীয়রা এদের বংশধর। (বিতর্কমূলক) (অনুচ্ছেদ ৩৮)

পণ্ডিতদের মতে আর্যদের রং লালচে সাদা, চুল কালো বা লাল, নাক সোজা। অবশ্য ক্ষেত্রবিশেষে বর্ণসাঙ্কর্যে কিছু কিছু পার্থক্য দেখা যায়। স্থান বিশেষে ব্যতিক্রম আছে। হিন্দুরাই 'আর্য' নামটি নিজেদের ওপরে চিরদিন ব্যবহার করেছে। দুনিয়ার সব জাতির চেয়ে হিন্দুরা সুশ্রী ও সুন্দর, একথা অপক্ষপাতে বলা যায়। (সৌন্দর্যদৃষ্টির আপেক্ষিকতায় মতটি বিতর্কমূলক)। কিন্তু ইউরোপীয়রা আমাদের চেয়ে সুস্থকায়। অবশ্য ওদের খাওয়া পরা অনেক ভালো এবং ওদেশে এদেশের মতো বাল্যবিবাহ নেই। যখন আমাদের অকালবার্ধক্য, তখন ওদের জীবন সুরু। আমাদের সব রোগ পেটে, ওদের হৃদয়ে! ফলে আমরা নৈরাশ্য ও বৈরাগ্যে পূর্ণ, আর ওরা মৃত্যুকাল পর্যন্ত আশা নিয়ে বাঁচে। আমাদের দেশের মানুষ সর্বদাই মরণের কথা বলে। আবার আমাদের দেশে দাঁত ও চুলের রোগ নেই, ওদের আছে। আমাদের পোষাক সৌন্দর্যে অতুলনীয়, কিন্তু কাজের উপযোগী নয়। কিন্তু ওদের পোষাক কাজকর্মের উপযোগী। তবে ওরাও পোষাকের ফ্যাশনে মন দিয়েছেন। ঘন ঘন ফ্যাশন পালটাচ্ছে এবং প্রভূত অর্থব্যয় হচ্ছে। অবস্থাভেদে পোষাক ওরা নিজেরাই তৈরী করে, আবার অনেক সময় অন্য দেশ থেকেও আনায়। আমাদের দেশের ফ্যাশন পোষাকে নয়, গয়নায়। এককালে ওদেশে কাশ্মীরী শালের খুব কদর ছিলো। এখন ফ্যাশন পালটে যাওয়ায় কাশ্মীর খুব ধাক্কা খেয়েছে। আমরা নতুন কিছু ব্যবস্থা করতে না পেরে অর্থাভাবে দিনযাপন করছি। ওরা ওদিকে প্রাণপণ পরিশ্রম করে চলেছে। আর, আমরা শুধু চীৎকার করে মরছি। মৌলিকতার

অভাবেই আমাদের এই দুর্গতি। (এখানে লেখক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তুলনা দিতে গিয়ে মূল বক্তব্যের ক্ষেত্রে পরস্পরবিরোধী উক্তি করায় তাঁর মতবাদ অত্যন্ত: দুর্বল হয়ে পড়েছে। বক্তব্যও অত্যন্ত বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়েছে।) (অনুচ্ছেদ ৩৯—৪১)

সমগ্র পৃথিবীতে হিন্দুদের মতো পরিচ্ছন্ন জাত আর নেই। (লেখক পৃথিবীর প্রসঙ্গ এনে এজাতীয় বহু মন্তব্য করেছেন। এখানে পরিচ্ছন্নতা দেশ বিভেদে আপেক্ষিক—এভাবেও বিতর্ক আসতে পারে।) হিন্দু ছাড়া আর কোনো জাত জলশৌচাদি করে না। পাশ্চাত্যজাতি-চীনেদের কাছ থেকে কাগজের ব্যবহার শিখেছে। এক আমেরিকা ছাড়া পাশ্চাত্যদেশের কোথাও স্নানাগারের তেমন বিশেষ ব্যবস্থা নেই। কদাচিৎ সামান্য জল হাতে মুখে দেয় মাত্র। স্নান করা ওদেশে বড়োলোকের লক্ষণ। তবে আমাদের সঙ্গে তাদের একটা তফাৎ আছে। আমরা স্নান করি অধর্মের ভয়ে, পাশ্চাত্যেরা হাত মুখ ধোয় পরিষ্কার হবে বলে। অবশ্য আমাদের শুচিবায় কখনো কখনো মাত্রাতিরেক হয়ে দাঁড়ায়। ওরা সভ্যতার খাতিরে শারীরিক ব্যাপার যতোটা পারে গোপন রাখে। আর আমরা সকলের সমক্ষে পরিচ্ছন্নতার নামে অনাচার করি। গরম দেশে আমরা বাস করি, তাই খেতে বসে প্রচুর জল খাই আর ঢেকুর তুলি। ওদের কাছে ঢেকুর তোলা অভদ্রতা। কিন্তু ওরা আবার খেতে বসে নাক পরিষ্কার করে। আমরা ময়লাকে খুব ঘৃণা করি, কিন্তু স্তূপাকার ময়লা ঘরের পাশে পচতে দিই। (রুচি বা আচার ব্যবহারের পার্থক্য দেখতে গিয়ে মূল বক্তব্যকে অস্পষ্ট করে ফেলেছেন লেখক।) (অনুচ্ছেদ ৪২—৪৬)

আমাদের রান্না ওদের তুলনায় অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। বিলিতি খাওয়ায় শৃঙ্খলা বেশি। আমাদের দেশে রাঁধুনী পরিষ্কারভাবে আচার পালন করে রান্না করে, কিন্তু ওদের দেশের রাঁধুনী নিজে

পরিষ্কার পোষাক পরলেও রান্নায় পরিচ্ছন্নতা বা আচারবিচার নেই। তবে খাওয়ার টেবিল বা পরিবেশন অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন। আমাদের খাওয়ার জায়গা বা পরিবেশন অপরিচ্ছন্ন।

(অনুচ্ছেদ ৪৭—৪৮)

আমরা স্নান করে ময়লা বস্ত্র পরি, ওরা স্নান না করে পরিষ্কার বস্ত্র পরে। হিন্দুরা ভেতরে অপরিচ্ছন্ন, বাইরে পরিচ্ছন্ন, এবং ওরা বাইরে পরিচ্ছন্ন, ভেতরে অপরিচ্ছন্ন। সমস্তই ঠিক উলটো। দুইয়ের সমন্বয় হলে ভালো হতো। অনাচারের জন্যেই আমাদের এত রোগ, এত দুঃখ। (অনুচ্ছেদ—৪৯)

শুদ্ধ আহার না হলে ইন্দ্রিয়গুলি যথার্থ কাজ করতে পারে না। আমাদের সমাজে খাদ্যাখাদ্য বিচারের মূলে এই তত্ত্ব। রামানুজ ভোজ্যদ্রব্য সম্পর্কে তিনটি দোষ বাঁচাতে বলেছেন—জাতি দোষ, আশ্রয় দোষ ও নিমিত্তদোষ। শেষের দুটি দোষ সবাই বর্জন করতে পারে। অনেক সময়েই এগুলো কুসংস্কার হয়ে দাঁড়ায়। পৃথিবীতে আমাদের মতো পবিত্র আহার অন্য কোথাও নেই। (সংস্কারযুক্ত মন্তব্য, তবে কিছু সত্যতা আছে।) এ বিষয়ে আমাদের দেশই শ্রেষ্ঠ শিক্ষাস্থল। (এক্ষেত্রেও বক্তব্য অনুরূপ।) প্রাচীন ও বর্তমান কালে আমিষ ও নিরামিষ আহার বিষয়ে বিভিন্ন মত প্রচলিত। জীবহত্যা নিয়েই বহুপ্রকার বিতর্ক আছে। মনুর বিধানের সঙ্গে জৈন, বৌদ্ধ ও বৈষ্ণবদের বিধানের অত্যন্ত পার্থক্য। এঁরা জীব হত্যার বিরোধী। তবে আধুনিক বৈষ্ণব সব খান। মাংস আহার নিয়ে বিভিন্ন মতামত প্রচলিত। নানা দেশের তুলনামূলক আলোচনাতেও সমস্যার সমাধান নেই। তবে হিন্দুদের ব্যবস্থা—জন্ম-কর্ম ভেদে আহারাদি পৃথক, এটাই উত্তম ব্যবস্থা। ধর্মজীবনের পক্ষে নিরামিষ এবং সাধারণ পরিশ্রমী মানুষের পক্ষে আমিষ আহার কর্তব্য। আবার নিরামিষাশীদের মধ্যেও নানা মতবিরোধ

আছে। তবে সর্ববাদী-সম্মত মত হচ্ছে এই যে, যা পুষ্টিকর অথচ শীঘ্র হজম হয়, এমন আহার সকলেরই কর্তব্য। (অনুচ্ছেদ ৫০—৫৫)

এদেশের খাদ্যের সমালোচনা করতে গিয়ে বলা চলে, ভাজা খাবারগুলি বিষ, ময়রার দোকান যমের বাড়ি। এদেশে গরীবরা অনাহারে মরে আর ধনীরা অখাদ্য খেয়ে মরে। আহারের মধ্যে নানা বিবেচনা করা উচিত। দুষ্পাচ্য খাদ্য বর্জন করা উচিত। অজীর্ণ ও প্রস্রাবের রোগ সাধারণতঃ আহারে অবিবেচনা থেকেই আসে। অজীর্ণ সবরোগের মূল কারণ। নিয়মিত ফাঁকা হাওয়ায় ভ্রমণ করা উচিত। ছুটি নিয়ে তীর্থভ্রমণ করা সকলেরই উচিত। তাহলে অনেক রোগের হাত থেকে বাঁচা যায়। ডাক্তার বা ওষুধকে পারতপক্ষে এড়িয়ে চলা ভালো। অধিকাংশ রোগই আমরা নিজেরা ডেকে এনে জীবন্মৃত হয়ে বেঁচে থাকি।

(অনুচ্ছেদ ৫৬—৫৮)

পাউরুটি না সেঁকে খেলে তা বিষবৎ। অশুদ্ধ জল ও অশুদ্ধ ভোজন রোগের কারণ। শাস্ত্রের বিধান অনেকগুলিই বিশেষ কল্যাণকর। ফিলটারকে বিশ্বাস করা চলে না, কারণ কিছুদিন পরেই তার শক্তি নষ্ট হয়ে যায় এবং সংক্রামক ব্যাধির সম্ভাবনা আবার আসে। আমাদের দেশের ফিলটার পদ্ধতি যত্ন নিয়ে প্রয়োগ করলে ভালো। জলে ফিট্‌কিরি দেওয়াও বেশ ভালো। বিলিতি ফিলটারের চেয়ে তা শতগুণে ভালো। আমেরিকায় এখন একেবারে ডিস্‌টিল্‌ড্‌ ওয়াটার চলছে। পয়সা থাকলেই আমাদের দেশের লোকেরা মণ্ডামেঠাই খায়, এটাই সর্বনাশের মূল। ফলে দুর্বল মানুষে এদেশ ভরে গেছে। ডাক্তাররা রোগের আসল কারণ দূর না করে ওষুধ দিয়েই দায়মুক্ত। দাঁত থাকতে দাঁতের মর্যাদা কেউ বোঝেনা। দশক্রোশ হাঁটা শরীরের পক্ষে অনেক ভালো। আমাদের দেশে পুষ্টিকর ও সস্তা খাওয়া পূর্ব বাংলায়। তাদের অনুকরণ করা

উচিত। যতো পশ্চিমে যাবে, ততোই খারাপ। সবাই 'কলকাত্তাই' হতে চেষ্টা করে, এটা অন্যায়। (অনুচ্ছেদ ৫৯)

যে দেশে যে শস্য প্রধান ফসল, গরীবদের তাই প্রধান আহার। অন্যান্য আহার আনুষঙ্গিক। বাংলা, উড়িষ্যা, মাদ্রাজ ও মালবার উপকূলে ভাত প্রধান খাদ্য। ভারতের অন্যত্র ধনীদের জন্যে গমের রুটি ও ভাত এবং সাধারণের জন্যে নানাপ্রকার বজ্‌রা, জনার ঝিঙ্গোরা ইত্যাদির রুটি। শাক, তরকারি, মাছ, মাংস ইত্যাদি মূল খাদ্যের আনুষঙ্গিক মাত্র। পাশ্চাত্যদেশে গরীবদের মধ্যে ঐ প্রকার রুটি ও আলুই প্রধান খাদ্য, তবে কালেভদ্রে মাংসের চাট্‌নিও চলে। স্পেন, পর্তুগাল, ইটালিতে প্রচুর দ্রাক্ষা জন্মায় এবং দ্রাক্ষা-মদ খুব সস্তা। ওতে নেশা হয় না, কিন্তু খুব পুষ্টিকর। মাছ মাংসের অভাব গরীবেরা অনেক সময় ঐ মদের দ্বারা পূরণ করে। রাশিয়া, সুইডেন, নরওয়ে ইত্যাদি অঞ্চলে গরীবদের আহার প্রধানতঃ রাই নামক ধানের রুটি, শুঁট্‌কি মাছ এবং আলু। ইউরোপের ধনী এবং আমেরিকার সকলের খাওয়া একরকম, অর্থাৎ রুটি, ভাত ইত্যাদি এবং মাছ ও মাংস। আমেরিকায় রুটি বিশেষ চলে না। মাছ বা মাংস অনেক সময় তারা শুধুশুধুই খায়, রুটির সঙ্গে নয়। প্রত্যেকবার থালা বদলানো হয়ে থাকে। বিভিন্ন জিনিস, কিন্তু অল্প পরিমাণে তারা খায়, পেট বোঝাই করে না। ফ্রান্সে সকালে কফি ও একটু রুটি মাখন আহার করে। দুপুরে অতি অল্প মাছ মাংস ইত্যাদি খাবার এবং রাত্রে পরিমাণে কিছু বেশি তারা আহার করে। জার্মানরা কিছু কিছু করে বারবার খেতে ভালবাসে এবং প্রতিবারেই মাংস থাকে। ইংরেজরা তিনবার খায়—সকালে অল্প, কিন্তু মধ্যে মধ্যে চা ও কফি আছে। আমেরিকানরা তিনবার বেশ ভালো করে আহার করে এবং মাংস প্রচুর খায়। এসব দেশে 'ডিনারই' প্রধান। ধনীদের মধ্যে ফরাসী কায়দার রান্না বেশি প্রচলিত। প্রথমে

ক্ষুধাবৃদ্ধির উপযুক্ত সামান্য সূচনা, তারপর নানা প্রস্থ নানা কায়দার আহার্য এবং প্রতিবার খাবার বদলের সঙ্গে মদের পরিবর্তন। ফল, মিষ্টি, মদের কুল্‌পি সবই চলে। আহার শেষে, ছোটো ছোটো গ্লাসে আসব-মদ্য ও ধূমপান। খাওয়ার রকমারির সঙ্গে মদের রকমারি দেখাতে পারলে 'বড়মানুষি চাল' বলা হয়। প্রচুর খরচ এতে হয় এবং এধরণের একটি আহারপর্বে আমাদের দেশের একটি মধ্যবিত্ত লোক সর্বস্বান্ত হতে পারে। (লেখক খাদ্যগ্রহণ পদ্ধতি আকর্ষণীয় বলেই অনেক অবকাশ গ্রহণ করে তা বর্ণনা করেছেন। বক্তব্যের ভারসাম্যরক্ষা সম্পর্কিত প্রশ্নটি বিবেচনাধীন)।

(অনুচ্ছেদ ৫০—৬৫)

আর্যরা একপীঠে বসতো, একপীঠে ঠেসান দিতো এবং জলচৌকির ওপরে থালা রেখে এক থালাতেই সকলে খেতো। এই রীতি এখনো পাঞ্জাব, রাজপুতানা, মহারাষ্ট্র ও গুর্জর দেশে বিদ্যমান। বাংলা, উড়িষ্যা, মালবার ইত্যাদি দেশের লোক মাটিতে বসেই আহার করে। করে। মুসলমানরা চাদর পেতে খায়। বার্মা, জাপান, ইত্যাদি দেশের লোক উবু হয়ে বসে মাটিতে থালা রেখে খায়। চীনেরা টেবিলে খায়। রোমান ও গ্রীকরা কৌচে শুয়ে টেবিলের ওপরে হাত দিয়ে খেতো। ইউরোপীয়রা আগেকার দিনে কেদারায় বসে টেবিলের ওপর থেকে হাত দিয়ে খেতো, আজকাল নানারকম কাঁটা চামচ ব্যবহার করে। চীনেদের আহার প্রায় একটা কসরৎ।

(অনুচ্ছেদ ৬৬—৬৭)

সব জাতিরই আদি পুরুষ প্রথম অবস্থায় যা পেতো, তাই খেতো। একটা জন্তু মেরে একমাস ধরে খেতো। ক্রমে সভ্য হয়ে তারা চাষবাস শিখে নিয়মিত আহারের ব্যবস্থা করেছে। এস্কিমোরা বরফের মধ্যে বাস করে, শস্য জন্মায় না। অতএব তাদের নিত্য-আহার মাংস। প্রথম থেকেই পচা মাংস খাবার অভ্যাস কোনো

কোনো জাতিই ছাড়তে পারেনি। একটা কিছু পচা চাইই—এমনকি চাট্‌নির আকারেও। ইউরোপীয়েরা এখনো বন্য পশু-পক্ষীর মাংস না পচলে খায় না। তাজা পেলেও টাঙিয়ে রাখে। কলকাতায় পচা হরিণের মাংস আদরের, রসা ভেটকি উপাদেয়। পনীর পচে তাতে যতো পোকা কিল্‌বিল্‌ করবে, ইংরেজদের কাছে তা ততো উপাদেয়। নিরামিষাশী যারা, তাদের কাছেও পেঁয়াজ-রসুন প্রিয়। শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হলেও, আরও দুর্গন্ধ হিংয়ের ব্যবহার চলে।

(অনুচ্ছেদ ৬৮—৭০)

সব ধর্মেই খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বিধিনিষেধ আছে, শুধু খ্রীষ্টধর্মে নেই। জৈন-বৌদ্ধ মাছ মাংস খায় না। আলু মূলো ইত্যাদি মাটির নীচে যা জন্মায়, জৈনরা তাও খায় না। যে-মাছে আঁশ নেই, ইহুদীরা তা খায় না। এরা শূয়োর খায় না, এবং যে জন্তুর জোড়া খুর নেই বা জাবর কাটে না, তাও তারা খায় না। মাছ মাংস রান্নার সময়ে রান্নাঘরে দুধ বা দুগ্ধজাত দ্রব্য আনলে সব ফেলে দিতে হয়। গোঁড়া ইহুদী অন্যজাতের রান্না খায় না। যথানিয়মে বলিদান না হলে হিন্দুদের মতো ইহুদীরাও মাংস খায় না। মুসলমানরা ইহুদীদের কিছু কিছু গ্রহণ করলেও বাড়াবাড়ি করে না। তবে তারা দুধ মাছ মাংস একত্র পান-আহার করে না। ইহুদীদের সঙ্গে হিন্দুদের অনেক মিল আছে। তবে তারা হিন্দুদের মতো বুনো শূয়োর খায় না। কোনো কোনো অঞ্চলে হিন্দুদের শূয়োর খাওয়া বিশেষ অনুষ্ঠান। বাঙালী মুরগী বা মুরগীর ডিম খায় না, কিন্তু হাঁসের ডিম খায়, নেপালীরাও তাই। কাশ্মীরীরা বুনো হাঁসের ডিম খায়, পোষা হাঁসের নয়। হিমালয় ছাড়া এলাহাবাদের পর থেকে যে ছাগল খায়, সে মুরগীও খায়। (অনুচ্ছেদ ৭১—৭৪)

এসব বিধিনিষেধের অধিকাংশই স্বাস্থ্যের জন্যে। মাংস ও দুধ খাবার বিধিনিষেধ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে দুধ পানের ক্ষেত্রে বিশেষ

সতর্ক থাকা দরকার। আমাদের শিশুদের অস্বাস্থ্যের প্রধান কারণ এটাই। সেকালে শত কুসংস্কারের মধ্যেও শিশু বেঁচে উঠতো ও সুস্থ সবল হতো, এটা খুব বিস্ময়ের কথা। (অনুচ্ছেদ ৭২—৭৭)

পরিধেয় বস্ত্র সবদেশেই ভদ্রতার পরিমাপ নির্ধারণ কিছুটা করে। আমাদের দেশে খালি গায়ে রাস্তায় বের হওয়া যায় না। ভারতের অন্যত্র পাগড়ী মাথায় না দিলে বাইরে বের হওয়া যায় না। পাশ্চাত্য দেশের সকলে ফরাসীদের অনুকরণ করে চলে। সবার বিশেষ পরিচ্ছদ থাকলেও ধনীরা ফরাসীদের নকল করে। মহিলাদের ক্ষেত্রে এটা আবার বিশেষ ফ্যাশনের ব্যাপার। তবে বর্তমানে (মন্তব্য: এখনকার দিনে নয়) পুরুষের পোষাক লণ্ডনে ভব্যতর, তাই পুরুষের পোষাক লণ্ডনে এবং মহিলাদের পোষাক প্যারিসে খুব চলনসই। বিদেশী আমদানী পোষাকের ওপর আমেরিকায় প্রচুর মাশুল, তা সত্ত্বেও তারা পোষাক প্যারিস থেকে আমদানী করে। কারণ আমেরিকা যথেষ্ট ধনশালী। (অনুচ্ছেদ ৭৮)

প্রাচীনকালে আর্যরা ধুতি চাদর পরতো। যুদ্ধের সময় ক্ষত্রিয়দের পোষাক ছিলো ইজার ও লম্বা জামা পরতো। পাগড়ী সকলেরই ছিলো। নারীরাও পাগড়ী ব্যবহার করতো। রাজ সামন্তরা ইজার ও লম্বা জামা—চোস্ত ইজার ও চোগা পরিধান করতো। ধুতিচাদর আর্যদের চিরন্তন পোষাক, তাই এখনও ক্রিয়াকর্মে ধুতিচাদর পরতেই হয়। প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদেরও পোষাক ছিলো ধুতিচাদর। যে বড়ো কাপড় তারা ব্যবহার করতো, তাকে বলা হতো তোগা, চোগা তারই অপভ্রংশ। কখনো বা একটা পিরাণও পরতো। তবে যুদ্ধের সময়ে ইজার ও জামা। মেয়েদের ছিলো লম্বা চওড়া চার কোণা জামা, যেন দুখানা বিছানার চাদর লম্বালম্বি সেলাই করা—চওড়ার দুদিকে খোলা। তার মধ্যে ঢুকে কোমর, বুকের নীচে ও পেটের নীচে বাঁধলেই হলো। তারপর ওপরের খোলা দু-পাট দু-হাতের ওপর

দু-জায়গায় তুলে মোটা সূঁচ দিয়ে যেন আটকানো—যেমন উত্তরাখণ্ডের পাহাড়ীরা কম্বল পরে। কাটা কাপড় ইরাণীরা প্রাচীনকাল থেকেই পরতো। এটা চীনেদের নকল। চীনেরাই সভ্যতার ভোগবিলাসের ও সুখস্বচ্ছন্দতার আদিগুরু। সেকেন্দার শাহ্ ইরাণ জয় করে ধুতি চাদর ফেলে ইজার পরতে শুরু করেন।

(অনুচ্ছেদ ৭৯—৮২)

গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কাপড়ের তেমন প্রয়োজন হয় না। শীতপ্রধান দেশে তার ঠিক উল্টো। অলঙ্কারের চেয়ে কাপড় চোপড়ের দিকে তাদের বেশি মনোযোগ এবং আমাদের যেমন অলঙ্কারের ফ্যাশন ঘন ঘন পাল্টায়, ওদের তেমনি কাপড়ের ফ্যাশন ঘন ঘন পাল্টায়। ও দেশে ঠিক মতো পোষাক না পরে বাড়ীর বাইরে যাবার উপায় নেই। ও দেশে মেয়েদের পা দেখানো খুবই লজ্জার, কিন্তু গলা বা বুকের কিছু অংশ উন্মুক্ত রাখাতে লজ্জা নেই। আমাদের দেশে মুখ দেখানো চলে না—ঘোমটা টানায় পায়ের কাপড় কিছুটা ওপরে উঠলেও ক্ষতি নেই। ও দেশে লোক ভোলাবার জন্যে নর্তকী ও পতিতারা দেহকে নগ্ন করে। তাদের নাচের অর্থ—তালে তালে শরীরকে অনাবৃত করে দেখানো। আবার আমাদের দেশে ভদ্রমেয়েরা খোলা গায়ে এবং নর্তকী-পতিতারা সর্বাঙ্গ আচ্ছাদিত থাকে। ও দেশের মেয়েরা শরীরকে অনাবৃত করে আকর্ষণ বাড়ায়, আর এদেশের মেয়েরা শরীরকে আবৃত করে আকর্ষণ বাড়াবার চেষ্টা করে। ওদেশে পুরুষে পুরুষে অসঙ্কোচে উলঙ্গ হয় এবং এদেশের মেয়েদের মতো স্নান করে। কিন্তু মেয়েদের সামনে বা রাস্তা ঘাটে ভালো ভাবে ঢাকা চাই। চীন ছাড়া সব দেশেই লজ্জা সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত ব্যাপার দেখা যায়। কোনো বিষয়ে খুবই লজ্জা, আবার তার চেয়েও লজ্জার জিনিস সম্পর্কে নির্বিকার ও অসঙ্কোচ। চীনে মেয়ে-পুরুষ সর্বদা আপাদ মস্তক ঢাকা, সেখানে নীতি খুব প্রবল। খ্রীষ্টান মিশনারীরা চীনে ভাষায় বাইবেল

অনুবাদ করেও ওদের খ্রীষ্টান করতে পারে নি। ওদের মতে, বাইবেল অশ্লীল বই, এবং পাদ্রীরা অসভ্য। তবে ও দেশেও লজ্জার তারতম্য আছে। ইউরোপ বা আমেরিকায় মলমূত্র ইত্যাদি বিষয়ে লজ্জা বেশি। (অনুচ্ছেদ ৮৩—৮৯)

ওদেশে আহার মাংসপ্রধান, তাই পরিমাণে অল্প। জল গ্রহণের রীতিও তেমন প্রচলিত নয়, কারণ শীত। তবে মদ সেখানে অপরিহার্য। ফরাসীরা একেবারেই জল খায় না। আমেরিকায় গরম বলে জল চলে। জার্মানরা খুব বীয়ার পান করে। ঠাণ্ডা দেশে সর্দি ও হাঁচি বেশি—আর এদেশে ঢেকুর বেশি, বিশেষ করে জল খেলে তো ঢেকুর উঠবেই। ওদেশে ঢেকুর তোলা অসভ্যতা, কিন্তু খাবার টেবিলে নাক পরিষ্কারে বেয়াদবী হয় না। এদেশের নিমন্ত্রকরা নিমন্ত্রিতদের ঢেকুরের শব্দ শুনতে না পেলে তৃপ্ত হন না, আর ওদেশে তাতে নিমন্ত্রক অপমানিত হন। ইংল্যাণ্ড ও আমেরিকায় মেয়েদের সামনে মলমূত্রের কথা বলা নিয়মবিরোধী, মেয়েরাও এ ব্যাপারে সঙ্কুচিতা। তবে ফ্রান্সে ততোটা লজ্জাসরম নেই। জার্মানদের আরো কম। ইংরেজ আমেরিকানরা মেয়েদের সামনে কথাবার্তায় অত্যন্ত সতর্ক। ফরাসীরা আমাদের মতো মুখ আল্‌গা, জার্মান বা রাশিয়ানরা সবার সামনেই খারাপ ভাষা ব্যবহারে সঙ্কোচবোধ করে না। প্রেম বিষয়ে কথাবার্তা ভাইবোনে মায়ে ছেলেতে অবাধে চলে। মা মেয়েকে ভাবী জামাই সম্পর্কে দ্বিধাহীন ভাবে জিজ্ঞাসা করেন। এতে ইংরেজ বা ফরাসী মেয়েরা কিছু লজ্জা পেলেও আমেরিকান মেয়েরা সপ্রতিভভাবে জবাব দেয়। ওদেশে এদেশের মতো গুরুজনের সামনে প্রণয়াত্মক ব্যবহার বা কথাবার্তা দোষের নয়। ওদের সমাজে প্রচুর টাকা, তাই কেতাদুরস্ত না থাকলে ছোটোলোক বলে ভাবা হয় এবং সমাজে তারা মিশতে পারে না। দিনে দুতিনবার পোষাক পাল্টাতে হয়। হাতে দস্তানা চাই। তবে গরীবরা এতোটা পারে

না। ভদ্র সমাজে থুথু ফেলা, কুল্‌কুচি করা বা দাঁত খোঁটা সাংঘাতিক অপরাধ। (অনুচ্ছেদ ৯০—৯৬)

ওদের ধর্ম শক্তি, কিছুটা বামাচার রকমের। মাতৃভাব যথেষ্ট। ক্যাথলিক ধর্মের প্রভাব বেশি। ঐ ধর্মের সব কাজেই মাতা মেরীর নাম কীর্তন। সব স্তরের মানুষই মেরীকে ভজনা করছে। তাছাড়া মেয়ের পূজা বা শক্তিপূজা ওদের সমাজে সর্বদাই চলে। শক্তি পূজা কেবল কাম নয়,—আমাদের মতোই শক্তিপূজা। তবে আমাদের পূজা ক্ষণবিশেষের—তীর্থক্ষেত্রে, এবং ওদের সর্বদা এবং সর্বত্র। সর্বাগ্রে স্ত্রীলোকের আসন, বসন, ভূষণ, ভোজন, আদর এবং উচ্চস্থান। রূপসী যুবতী হলে তো কথাই নেই। ইউরোপে এই নারীপূজা আরম্ভ করে মূরেরা। তারপর মূরেরা সব ভুলে গেলো, সে শক্তির সঞ্চার হলো ইউরোপে। মা মুসলমান ছেড়ে খৃষ্টানের ঘরে গিয়ে উঠলেন। (অনুচ্ছেদ ৯৭—৯৮)

ইউরোপ এযুগে কোন্ শক্তিতে একছত্র, তার রহস্য বুঝতে হলে পাশ্চাত্য ধর্মের আকর ফ্রান্স থেকে বুঝতে হবে। পৃথিবীর শক্তিকেন্দ্র ইউরোপ, ইউরোপের শক্তি কেন্দ্র প্যারিস। শহরটি যেন মহাসমুদ্র—সমগ্র ইউরোপের কর্মক্ষেত্র। অতি উর্বরা, নাতিশীতোষ্ণ, এখানে অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি নেই। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যথেষ্ট। মানুষও সৌন্দর্যপ্রিয়। ফ্রান্স প্রাচীনকাল থেকে বহু জাতির সংঘাত-ভূমি। প্রাচীন গ্রীক ও রোম বর্বর-আক্রমণে তলিয়ে গেলে ইউরোপের আলো নিভে গেলো এবং এশিয়ায় বর্বর আরব জাতির প্রাদুর্ভাব হলো। ফলে ইসলাম ধর্মও আরবী ধর্ম ও পারসী সভ্যতার মিলনে আর এক রূপ পরিগ্রহ করলো। পারসী সভ্যতা প্রাচীন গ্রীক ও ভারতবর্ষ থেকে গড়ে উঠেছিলো। তা ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। পূর্ব ও পশ্চিম থেকে মুসলমানরা প্রবল ভাবে ইউরোপকে আঘাত করলো—সঙ্গে সঙ্গে বর্বর ইউরোপে জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। প্রাচীন গ্রীকদের

সংস্কৃতি বর্বরাক্রান্ত ইটালিতে প্রবেশ করে রোম ও ফ্লোরেন্সে নতুন প্রাণ-স্পন্দন জাগালো। পুরোনো ইটালি নবজীবনে রূপান্তরিত হলো এই নবজন্মই রেনেশাঁস। জন্ম হলো ইটালির ইউরোপের অন্যান্য অংশের তখন প্রথম জন্ম। যে সময়ে আকবর জাহাঙ্গীর সাজাহান প্রমুখ মোগল সম্রাট ভাবতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য তুলে ধরেছেন, এই সময়ে ইউরোপে নবজন্ম। (অনুচ্ছেদ—৯৯-১০৩)

প্রাচীন জাতি ইটালি আবার ঝিমিয়ে পড়লো: ভারতও আকবরের সময় তিনপুরুষ জেগে উঠে আবাব ঝিমিয়ে পড়েছিলো। ইউরোপে ইটালির পুনর্জন্ম ঘটলো এবং তা বলবান্ ফ্রাঁ জাতিকে স্পর্শ করলো। নবীন জাতি সাগ্রহে তা গ্রহণ করলো। ইউরোপের অন্য সব জাতি তাকে আরো বিস্তার করে নিজেরা শক্তিশালী হলো। ভারতবর্ষে সেই তরঙ্গ এসে আঘাত করলো। জাপানও এশিয়ার মধ্যে নতুন শক্তি রূপে বেঁচে উঠলো। (অনুচ্ছেদ ১০৪-১০৫)

প্যারিস ইউরোপীয় সভ্যতা-গঙ্গার গোমুখ। এই বিরাট রাজধানী যেন মর্ত্যের অমরাবতী—সদানন্দ-নগরী। লণ্ডন, বার্লিন, নিউইয়র্কে এই আনন্দ ও বিলাস অনুপস্থিত। কারণ ফরাসী জাতি আর কোথাও নেই। ফরাসী চরিত্রের তুলনা হয় না। নৈরাশ্য তাদের দাবাতে পারে না। প্যারিসের বিশ্ববিদ্যালয় ইউরোপের আদর্শ। অনেক বিষয়ে অন্যেরা এরই নকল করছে। ফরাসী জাত যা করে, অন্যজাত অনেক পরে তার অনুসরণ করে। ফরাসী সভ্যতার ঢেউ যখন স্কট্ল্যাণ্ডে লাগলো তখন স্কট্ল্যাণ্ডের রাজা ইংল্যাণ্ডের রাজা হলেও ইংরেজও ফরাসী সভ্যতার স্পর্শে জেগে উঠলো। ফ্রান্স স্বাধীনতার আবাস ভূমি। একদিন এদেশে প্রজাশক্তি সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতার বাণীতে আন্দোলিত হয়ে উঠেছিলো। এখন ফ্রান্সের অন্য ভাব এবং ইউরোপের অন্য জাতিরা ফ্রান্সের বিপ্লবের বাণীকে নিজের দেশে সফল করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত। (অনুচ্ছেদ ১০৬—১০৯)

যে দেশ যতো পরিমাণে প্যারিস নগরীর সঙ্গে নিজেদের যোগ স্থাপন করতে সক্ষম হবে, সেই জাতি ততো পরিমাণে উন্নতি লাভ করবে। এই নগরীর মধ্যে দিয়েই জগতের সব নতুন ভাব প্রচারিত হচ্ছে। ভাস্কর, চিত্রকর, সঙ্গীতজ্ঞ ইত্যাদি এখানে প্রতিষ্ঠা পেলে অন্যত্র পাবে। আমাদের দেশে প্যারিসের যে বদনাম শোনা যায়—তা ইংরেজদের অপপ্রচার। ইন্দ্রিয় চর্চা বার্লিন, লণ্ডন, ভিয়েনা, নিউ-ইয়র্কেও কম নয়। কিন্তু প্যাবিসেব সব কিছুতেই এমন সৌন্দর্য আছে যার তুলনা নেই। ভোগবিলাসের ইচ্ছে সব জাতিরই আছে, তাই সবাই তারা প্যারিস মুখো দৌড়োয়। তাদের বিলাস-বাসনা এখানে সুসিদ্ধ হয়। ফরাসীবা বিলাসের সপ্তমে পৌঁছেছে। তবে এদের কদর্য আনন্দবিলাস বিদেশীদের জন্যে। ফরাসীরা নিজেরা খুব সাবধান, বাজে খরচ করে না। তারা সুসভ্য, আহম্মক বিদেশী অর্থবান্‌দের খাতিব করে অর্থদোহন করে। আমেরিকান, জার্মান, ইংরেজ—সকলেই সামান্য আলাপে বাড়ীতে অতিথি হতে আমন্ত্রণ জানায়। কিন্তু বিশেষ পরিচিত না হলে ফরাসীরা কাউকে বাড়ীতে জায়গা দেয় না। তবে একবার কেউ বাড়ীতে স্থান পেলে তার ধারণা পাল্টায়। এমন বিলাসের দেশেও অবিবাহিতা মেয়েরা আমাদের দেশের মতোই সুরক্ষিতা। বিবাহের পর স্বামীর সঙ্গে সমাজে মেশবার সুযোগ পায়। বড়ো সামাজিক ব্যাপারে নৃত্য-অনুষ্ঠান হয়। অন্য সব জাতি সেই নৃত্য উপভোগ করে নিজেব দেশে ফবাসীদের রুচির কথা তুলে বদ্‌নাম ছড়ায়। স্ত্রীলোকের বিষয়ে সব দেশেই এক ব্যাপার। পুরুষের শত ব্যভিচারেও দোষ হয় না, স্ত্রীলোকের বেলাতেই বিপদ। পুরুষরা ওদেশে একটু খোলামেলা। অবশ্য এতে ওদেশে কোনো দোষ নেই। বরং তার বিপরীত কিছু দেখলেই বাবা মা শঙ্কিত হয়ে পড়েন। তবে পুরুষের একটি গুণ থাকা চাই, সেটা—সাহস। ওদের 'Virtue' শব্দটি আর আমাদের 'বীরত্ব' শব্দ

একার্থবাচক। এটাই পুরুষের সততা। স্ত্রীলোকের সতীত্ব অবশ্যই দরকার। (অনুচ্ছেদ ১১০—১১৬)

প্রত্যেক জাতির এক একটি জীবনোদ্দেশ্য আছে। সেখান থেকে সে-জাতির রীতি নীতি বিচার করতে হবে। আমাদের দৃষ্টি নিয়ে ওদের, এবং ওদের দৃষ্টি নিয়ে আমাদের দেখবার রীতিটিই ভ্রান্ত এদেশে ব্রহ্মচারী কামজয়ীর সমার্থক। আমাদের উদ্দেশ্য মোক্ষ, ব্রহ্মচর্যের দ্বারা তা সিদ্ধ হয়। ওদেশের লোকের উদ্দেশ্য ভোগ, ব্রহ্মচর্যের আবশ্যকতা ততো নেই। তবে সব দেশেই স্ত্রীলোকের সতীত্বের ওপরে বিশেষ আগ্রহ। (অনুচ্ছেদ ১১৭—১১৯)

আগের তুলনায় প্যারিসের অনেক পরিবর্তন হয়েছে। আজকালকার যে প্যারিস, তা তৃতীয় নেপোলিয়ানের তৈরী। প্রজাদের তুষ্ট করবার জন্যে তিনি ক্রমাগত রাস্তাঘাট, তোরণ থিয়েটার ইত্যাদি গড়েছেন। অবশ্য পুরোনো মন্দির, তোরণ, স্তম্ভ তিনি টিকিয়ে রাখলেন। নতুন ধরনের রাস্তা বুলভারের অভ্যুদয় হলো, পৃথিবীর অদ্বিতীয় শাঁজেলিজে রাস্তাও তৈরী হলো। এই প্রশস্ত রাস্তার ভেতরে ও পাশ দিয়ে বাগান চলেছে এবং এক জায়গায় বেশ বড়ো গোলাকার স্থান। তার নাম হচ্ছে প্লাস্ দ লা কনকর্দ। এর সঙ্গে এককালের দিল্লীর চাঁদনীচকের মিল আছে বলে মনে হয়। স্থানে স্থানে বিজয় তোরণ এবং বিভিন্ন ভাস্কর্য মূর্তি। প্রথম নেপোলিয়ানের এক সুবৃহৎ ধাতুনির্মিত বিজয় স্তম্ভও আছে। ওপরে তাঁর মূর্তি। অন্য একস্থানে রাজাদের অত্যাচারের চিহ্ন বাস্তিল দুর্গের ধ্বংসাবশেষ। কতো মানুষ যে এই কারাগারে বিনা বিচারে অত্যাচার সয়েছে, তার হিসেব নেই। বিপ্লব সুরু হলে এই দুর্গ ধ্বংস হয়। স্বাধীনতা-সাম্যের নামে বিপ্লবীরা রাজারাণী ও অভিজাতদের অনেককে হত্যা করলো। ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলো। ইউরোপের অন্য রাজারা নিজেদের অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়লো এবং চারদিক থেকে ফ্রান্স

আক্রমণ করলো। তখন প্রজাতন্ত্রের নেতারা জন্মভূমি বিপন্ন বলে ঘোষণা করলেন এবং সমগ্র জাতি মার্সাই-এ মহাগীত গাইতে গাইতে ঐক্যবদ্ধ হলো। এই ফরাসী সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দিয়েছিলেন নেপোলিয়ান। (অনুচ্ছেদ ১২০—১২২)

সমগ্র ইউরোপে যুদ্ধের আগুন জ্বললো। ফ্রান্সের তিনরঙা পতাকার জয় ঘটলো। তারপর নেপোলিয়ান ফ্রান্সকে সুসংবদ্ধ করবার জন্যে নিজেই সম্রাট হলেন। সন্তান না হওয়ায় তিনি রাণী জোসেফিনকে ত্যাগ করেন এবং অষ্ট্রিয়ার রাজকন্যাকে বিবাহ করেন। পরে রাশিয়া জয় করতে গিয়ে বরফে তাঁর সৈন্যদল নিশ্চিহ্ন হলো। তখন ইউরোপ সুযোগ পেয়ে তাঁকে সিংহাসন ত্যাগ করিয়ে একটি দ্বীপে নির্বাসন দেয় এবং পুরোনো রাজার বংশের একজনকে সিংহাসনে বসায়। আবার সেই দ্বীপ থেকে এসে নেপোলিয়ান যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন, কিন্তু এবারেও সম্পূর্ণ পরাজিত হয়ে তিনি সেণ্ট হেলেনা দ্বীপে আমরণ বন্দী রইলেন। আবার পুরোনো রাজা এলেন, তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র রাজা হলেন। আবার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলো। তৃতীয় নেপোলিয়ান কিছুকাল প্রতাপের সঙ্গে রাজত্ব করেন। জার্মান যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি সিংহাসন থেকে বঞ্চিত হন এবং ফ্রান্সে আবার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হয়। তখন থেকে ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্রই চলছে।

(অনুচ্ছেদ ১২৩—১২৪)

ভারতের প্রায় সব সম্প্রদায়ের মূল ভিত্তি পরিণামবাদ (Evolution theory)। এখন সেই পরিণামবাদ ইউরোপীয় বহির্বিজ্ঞানে প্রবেশ করেছে। অন্য সবদেশের ধর্মেই দুনিয়ার সব বস্তুকে পৃথক্ পৃথক্ বলে মনে করা হতো। বহুর মধ্যে এককে দেখার নামই জ্ঞান, এবং বস্তুতঃ আপাত পৃথক্ বলে মনে হলেও পৃথিবীর সব বস্তুর মধ্যে একটি আভ্যন্তরীণ ঐক্য আছে এবং এটাই প্রাকৃতিক নিয়ম। আমাদের চিন্তা, বুদ্ধি ইত্যাদি সবই আধ্যাত্মিক, সমস্ত বিকাশ ধর্মে। ওদেশের

ক্ষেত্রে এই সব বিকাশ বাইরে—শরীরে ও সমাজে। ভারতই সর্ব প্রথমে সব বস্তুর মধ্যে ঐক্য লক্ষ্য করেছে। অদ্বৈতবাদীর মতে যা কিছু সৃষ্টি—সবই সেই একের বিকাশ। এই অধ্যাত্ম ও অধিভূত জগৎ ব্রহ্ম ; এবং যা কিছু পৃথক্ পৃথক্ বলে বোধ হচ্ছে—তা মায়া, অবিদ্যা —অর্থাৎ অজ্ঞান। এটাই জ্ঞানের চরম সীমা। জড়বিজ্ঞানের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্য জগৎ নিজের মতো করে এখন তা বুঝতে পারছে। 'এক' কী করে 'বহু' হলো, না বোঝা কঠিন। তবে 'এক' কোন্ কোন্ প্রকার হয়েছে বা কোন্ কোন্ রূপ পরিগ্রহ করেছে, তার সন্ধান দিচ্ছে বিজ্ঞান।

(অনুচ্ছেদ ১২৫—১২৮)

ওদেশে আজকাল প্রায় সকলেই পরিণামবাদী। ওরা আজ বিশ্বাস করছে যে, মানুষ ও সমাজ ক্রমশঃ বর্তমান অবস্থায় বিবর্তিত হয়েছে। বহু স্তর পার হয়ে মানুষ সুসভ্য অবস্থায় এসে উপনীত হয়েছে। আদিম যুগের মানুষ কাঠ বা পাথরের যন্ত্রপাতি ব্যবহার করতো; চামড়া বা পাতা পরে থাকতো এবং পাহাড়ের গুহায় বা কুঁড়ে ঘরে বাস করতো। ক্রমে তারা ধাতুর ব্যবহার শিখলো, টিন ও তামা আবিষ্কৃত হলো। লোহার ব্যবহার তারা জেনেছে আরো অনেক পরে। প্রাচীন গ্রীক, বাবিল ও মিশরীয়রা এর ব্যবহার অনেক পরে জেনেছিলো। অপেক্ষাকৃত সভ্য হয়ে তারা বইপত্র পর্যন্ত লিখেছে। আমেরিকার আদিম মেক্সিকো, পেরু, মায়া প্রভৃতি জাতি অপেক্ষাকৃত সভ্য ছিলো, তারা বিরাট বিরাট মন্দির নির্মাণ করতো। সোনা-রূপোর ব্যবহার খুব বেশি ছিলো। আদিম অবস্থায় মানুষ তীরধনুক বা জালের সহায়তায় জন্তু-জানোয়ার বা মাছ মেরে আহার করতো। তারা মৃগয়াজীবী থেকে ক্রমে ক্রমে কৃষিজীবী হয়েছে। তারা ক্রমে পশুপালনও শিখেছে। নানা জাতের বৃক্ষলতা বা পশুপক্ষী দেশ-বিদেশে গৃহীত ও মিশ্রিত হতে হতে বিভিন্ন নতুন জাতের

উদ্ভিদ্ ও প্রাণী মানুষের সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সৃষ্টি হয়েছে। (অনুচ্ছেদ ১২৯—১৩১)

আদিম যুগে বিবাহের রীতি ছিলো না। ক্রমে ক্রমে যৌন সম্বন্ধ স্থিরীকৃত হলো। প্রথম বৈবাহিক সম্পর্ক সর্ব সমাজের ক্ষেত্রেই মাতার ওপরেই নির্ভরশীল ছিলো। পিতার সংবাদ কেউ রাখতো না। সন্তানদের নামকরণ মাতার নামানুসারে ঘটতো। মেয়েদের ওপরেই সবকিছু পরিচালনার দায়িত্ব ছিলো। ক্রমে ক্রমে সব কিছু পুরুষের হাতে গেলো। এমন কি মেয়েদের অধিকারগুলিও। আজকালকার বিবাহপ্রথা তারই পরিণতি। নারী অবশেষে পুরুষের সম্পত্তি রূপে পরিগণিত হলো। আগেকার দিনে বিবাহ হতো জবরদস্তির মধ্যে দিয়ে, একদলের পুরুষ বা মেয়ের সঙ্গে অন্য দলের মেয়ে বা পুরুষের। ক্রমশঃ স্বেচ্ছায় বিবাহের রীতি প্রচলিত হলো। এখনো দেখা যায়, অনেক স্থানে বরকে কৃত্রিম আক্রমণ ও গালিগলাজ সহ্য করতে হয়। (অনুচ্ছেদ ১৩২)

এই ভাবে সমাজ সৃষ্টি হলো। বিভিন্ন দেশে সমাজের বিভিন্ন রূপ। সমুদ্রতীরে মৎস্যজীবী, সমতল ভূমিতে কৃষিজীবী, মরু বা পার্বত্য অঞ্চলে পশুচারণজীবী, বনাঞ্চলে শিকারজীবী। তবে যাদের জীবিকা কৃষিকর্ম, খাদ্য সম্পর্কে তারা অনেকটা নিশ্চিন্ত। মানুষ যতোই সভ্য হতে লাগলো, মানুষ ততোই শারীরিক ভাবে দুর্বল হতে লাগলো। অন্য দলের সকলের খাদ্যাভাব ঘটলে তারা সমতল বাসীদের ওপরে আক্রমণ চালাতো এবং খাদ্য লুণ্ঠন করে নিয়ে যেতো। সমতলবাসীরা এই আশঙ্কায় সমবেত হয়ে রাজ্য সৃষ্টি করলো। এই ভাবেই দেবতা ও অসুরের জন্ম। দেবতারা শস্য আহার করে, অবস্থা সুসভ্য, বাস গ্রাম-নগরে উদ্যানে, পরিধানে বোনা কাপড়,—আর, অসুররা পাহাড় বা মরুভূমিতে বাস করে, তাদের আহার্য বন্য জানোয়ার, পরিধানে পশুচর্ম, তাদের শস্য অর্জন বন্য

দ্রব্যাদির বিনিময়ে। দেবতারা শ্রম সহ্য করতে পারে না, তারা দুর্বল ; অসুরের শরীরে প্রচণ্ড শক্তি। অসুররা খাদ্যাভাব ঘটলেই দল বেঁধে গ্রামনগর লুণ্ঠন করতো। দেবতা ঐক্যবদ্ধ না হলেই তাদের সর্বনাশ। দেবতার দৈহিক শক্তি না থাকলেও ছিলো মস্তিষ্কের শক্তি। তারা সৃষ্টি করলো ব্রহ্মাস্ত্র, গরুড়াস্ত্র, বৈষ্ণবাস্ত্র, শৈবাস্ত্র ইত্যাদি। তুলনায় অসুররা বারবার হারিয়ে দিয়েও সভ্য হতে পারলো না। কিছুদিনের মধ্যেই তারা দেবতাদের বুদ্ধি-বলে পরাজিত হলো। ফলে, হয়তো তারা দেবতাদের দাস হয়ে পড়তো, কিংবা লুণ্ঠন করে নিজ স্থানে ফিরে যেতো। ক্রমে ক্রমে সংঘাত তীব্র হলো। অসংখ্য দেবতা ও অসুর দলবদ্ধ হয়ে ক্রমাগত যুদ্ধ এবং জয় পরাজয় ঘটাতে লাগলো। এর ফলে সবরকম ভাবধারা মিশ্রিত হয়ে বর্তমান সমাজের উৎপত্তি হলো। (পৌরাণিক দেবাসুর প্রসঙ্গকে আধুনিক সমাজতত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করবার মূল উদ্দেশ্য, সমাজতত্ত্ব-সচেতন আধুনিক ব্যক্তিদের কাছে দেবাসুর প্রসঙ্গ মূল্যযুক্ত করে উপস্থাপিত করা এবং এই ভাবে প্রাথমিক কার্যসমাপনান্তে তাদের মধ্যে আধ্যাত্মিক বীজ সঞ্চার করা।) সমাজের উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গে নানা প্রথা, নানা ভাব ও নানা বিদ্যার আলোচনা চললো। একদল ব্যক্তি ভোগের সামগ্রী তৈরী করতে লাগলো, অন্যদল সেই সামগ্রী রক্ষা করতে লাগলো। কেউ বা তা বিনিময় করতে লাগলো। কেউ বা একস্থান থেকে অন্যস্থানে চালান করবার নামে অধিকাংশ আত্মসাৎ করলো কেউ বা পাহারা দিলো। যে চাষ করলো, তার ভাগ্যে কিছুই জুটলো না ; পাহারাদার জবরদস্তি করে কিছু অংশ গ্রহণ করলো, অধিকাংশ নিলো ব্যবসাদার, যে কিনলো, সে দাম দিলো। পাহারাদারের নাম রাজা, মুটের নামান্তর বণিক,—কাজ না করে এই দুই দল সেরা অংশ ভোগ করতে লাগলো। যে খেটে মরলো, সে পেটে হাত দিয়ে ভগবানের নাম করতে লাগলো। এইভাবে ক্রমে সমাজ জটিল হয়ে

পড়লো। পুরোনো অভ্যাসের বিবর্তনে দস্যু ও বেশ্যার উৎপত্তি হলো। (অনুচ্ছেদ ১৩৩—১৩৬)

প্রাচ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার মূল অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, জম্বুদ্বীপের সমস্ত সভ্যতারই আদি ভিত্তি চাষবাস--এই সব সভ্যতাই দেবতা-প্রধান। ইউরোপের সব সভ্যতাই ডাকাত ও বোম্বেটে প্রধান, সুতরাং এতে অসুর ভাবেরই প্রাধান্য। বর্তমানে জম্বুদ্বীপের মধ্যবর্তী স্থান ও আরবের মরুভূমি অসুরদের রাজত্ব—এরা সভ্য দেবতাদের বিতাড়িত করে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছে। আদিমযুগে ইউরোপের অধিবাসীরা পর্বত-গহ্বরে বাস করতো, যারা তাদের মধ্যে কিছু বুদ্ধিমান্, তারা ঘরদোর নির্মাণ করে বাস করতো, অন্যান্য জীবনচর্যাতেও তারা কিছু উন্নত ছিলো। ক্রমশঃ জম্বুদ্বীপের নরস্রোত ইউরোপে এসে পড়লো। এই ভাবে কোথাও কোথাও সভ্যজাতির উদ্ভব হলো। (অনুচ্ছেদ ১৩৭—১৪০)

এশিয়া মাইনর থেকে একদল সুসভ্য মানুষ নিকটস্থ দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে অপূর্ব এক সভ্যতার সৃষ্টি করলো—তারই নাম গ্রীক সভ্যতা। পরে ইটালিতে রোমানজাতি ইট্রসকান নামক সভ্যজাতিকে পরাজিত করে নিজেরা সভ্য হলো এবং ইউরোপের দক্ষিণ-পশ্চিম ভাগে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করলো। ক্রমে ক্রমে রোম ঐশ্বর্য বিলাসের মধ্যে দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়লে আবার জম্বুদ্বীপের অসুরদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হলো। ইউরোপের বর্বর ও ধ্বংসাবশিষ্ট গ্রীক ও রোমান মিলে এক নতুন জাতির সৃষ্টি হলো। ইহুদী জাতিরাও ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিলো। নতুন খ্রীষ্টধর্মও প্রচারিত হয়েছিলো। দেখা যাবে, এই ভাবেই বিভিন্ন জাতি ও ভাবধারার মিশ্রণে ইউরোপীয় জাতির গঠন হলো। (অনুচ্ছেদ ১৪১—১৪২)

বর্বর ইউরোপীয়রা কিছুকাল নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হলো। খ্রীষ্টধর্মের দুইগুরু—ইটালির পোপ এবং পশ্চিমে কন্‌স্টান্টি-

নোপলের পাট্রিয়ার্ক। তাদের রাজারাণী এইসব বর্বরদের ওপরে নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করলো। ওদিকে মরুভূমি আরবে মুসলিম ধর্মের উদ্ভব হলো। বন্য আরব পশ্চিম ও পূর্ব—দুই প্রান্ত থেকেই ইউরোপকে আঘাত করলো। সেই স্রোতে ভারত এবং প্রাচীন গ্রীসের জ্ঞানালোক ইউরোপে প্রবেশ করলো। মুসলিম তাতারগণ এশিয়া মাইনরের অনেক অংশ জয় করেছিলো সত্য, কিন্তু আরবরা ভারতকে অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও জয় করতে পারে নি। কয়েক শতাব্দী পরে তুর্ক ইত্যাদি তাতার জাতি বৌদ্ধধর্ম ত্যাগ করে মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করলো। এই তুর্কীরা হিন্দু, পার্সী, আরব—সব জাতিকেই দাসে পরিণত করলো। ভারতের মুসলমান বিজেতারা সবাই ছিলো তুর্ক তাতার। কুতুবউদ্দিন থেকে আরম্ভ করে মোগল বাদ্‌শাহ্‌রা সবাই তাতার। বর্তমান যুগেও কাবুল, পারস্য, আরব, কনষ্টান্টিনোপল ইত্যাদি স্থানে রাজত্ব করছে সেই অসুর তাতার। চীনদেশেও একই ব্যাপার। এই অসুরজাতি কখনো কোনোদিন বিদ্যাবুদ্ধির চর্চা করে নি, একমাত্র লড়াইই জানে। রুশ জাতের মধ্যেও এদের রক্ত। দেবতা আর অসুর মিলে মিশ্রিত জাতির সৃষ্টি হয়।

(অনুচ্ছেদ ১৪৩—১৪৬)

তাতাররা ক্রমে আরবী খলিফার সিংহাসন কেড়ে নিলো এবং খ্রীষ্টানদের মহাতীর্থ জেরুজালেম ইত্যাদি দখল করে খ্রীষ্টানদের তীর্থযাত্রা বন্ধ করে দিলো। ফলে মুসলমান আর খ্রীষ্টান দ্বন্দ্ব বাধলো। জেরুজালেম উদ্ধার হলো না বটে, কিন্তু ইউরোপ সভ্য হতে লাগলো! বর্বর ইউরোপীয় জাতিরা এশিয়ার সভ্যতা শিক্ষা পেতে লাগলো। এক শ্রেণীর খ্রীষ্টান অদ্বৈতবাদী হয়ে খ্রীষ্টধর্মকেই ব্যঙ্গ করতে লাগলো। রুষ্ট পোপের আদেশে তাদের ওপরে নির্যাতন চললো। অন্যদিকে মূর জাতীয় মুসলমানরা স্পেন অধিকার করে সুসভ্য রাজ্য স্থাপন করলে এবং নানাবিদ্যা চর্চার সঙ্গে ইউরোপে প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

করলো। ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে ছাত্ররা সেখানে শিক্ষার্থে গমন করতে লাগলো। কিন্তু সমগ্র ইউরোপ একটি বিরাট সেনানিবাস হয়ে দাঁড়ালো। আজও সেই ভাব চলছে। রাজা ও সামন্তরা অবশিষ্ট প্রজাদের দাস করে রাখলো। তারা নির্দেশমাত্র যুদ্ধযাত্রায় উপস্থিত হবার সর্তে সামন্তদের অধীনে জীবিত রইলো। এক কথায় ইউরোপীয় সভ্যতা সম্পর্কে বলা চলে যে, এটা নাতিশীতোষ্ণ পার্বত্য সমুদ্রতটময় প্রদেশের সর্বদা যুদ্ধপ্রিয় বলবান্ নানা জাতির মিশ্রিত এক জাতির ক্রমাগত যুদ্ধ ও বাণিজ্যময় সভ্যতা। এ সভ্যতার উপায় তলোয়ার, সহায় বীরত্ব এবং উদ্দেশ্য ঐহিক ও পারলৌকিক ভোগ। (অনুচ্ছেদ ১৪৭—১৫১)

অন্যদিকে আমাদের সভ্যতা শান্তিপ্রিয়। কৃষিকর্মের মধ্যে দিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে স্ত্রী-পরিবার পালন করতে পারলেই আমরা তৃপ্ত। ফলে চিন্তাশীলতার ও সভ্য হবার অবকাশ আমাদের বেশি। আমাদের জনক রাজা প্রথম থেকেই লাঙল চালিয়েছেন এবং তিনি সেকালের সর্বশ্রেষ্ঠ আত্মবিৎ। যোগী, ঋষি ইত্যাদির আবির্ভাব আমাদের সভ্যতার গোড়া থেকে। প্রথম থেকেই তাঁরা জেনেছেন যে, সংসারটা প্রতারণাময়, ভোগের সন্ধানে মানুষ দ্বন্দ্বে লিপ্ত হচ্ছে, কিন্তু শান্তির মধ্যেই তার সমাধান; শান্তি আছে শারীরিক ভোগ বিসর্জনে, মননশীলতায় ও বুদ্ধিচর্চায়—ইন্দ্রিয় চর্চায় নয়। বন পরিষ্কৃত করে সেখানে নির্মিত হলো যজ্ঞবেদী। তলোয়ার রইলো বিদ্যা ও ধর্মের নীচে। তলোয়ারের একমাত্র কাজ হলো ধর্মরক্ষা করা. মানুষ ও গবাদি পশুর পরিত্রাণ করা। আমাদের বীরের নাম ক্ষত্রিয়। সবকিছুর অধিপতি ধর্ম এবং ধর্মের আশ্রয়ে সকলেই স্বাধীন ও নিরাপদ রইলো।

(অনুচ্ছেদ—১২৫ – ১৫৪)

ইউরোপীয় পণ্ডিতরা সিদ্ধান্ত করেন, আর্যরা কোথা থেকে এসে এদেশের আদিবাসীদের ধ্বংস করে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার

করেছে। কিন্তু এ অনুমান ভিত্তিহীন। ইউরোপীয়ানদের স্বভাব, অপরকে ধ্বংস করে সুখেস্বাচ্ছন্দ্যে বাস করা। নিজেদের সেই স্বভাবকে আর্যদের ওপরে তারা আরোপ করে নি, তা বলা চলে না। রামায়ণ জাতি আর্যজাতি কর্তৃক অনার্য বিজয়ের উপাখ্যান নয়। লঙ্কার সভ্যতা বরং অযোধ্যার সভ্যতার চেয়ে উন্নত ছিলো। দু-এক স্থানে আর্যদের সঙ্গে হয়তো আদিবাসীদের যুদ্ধ হতো কিন্তু তা ধর্মরক্ষার্থেই হয়েছে। তবে আর্যরা যে আদিবাসীদের রাজ্য অধিকার করেছে, এমন সিদ্ধান্ত করা যায় না। এককথায় আর্যসভ্যতা সম্পর্কে বলা যায় যে, এটা হচ্ছে বিশাল নদনদীপূর্ণ উষ্ণপ্রধান সমতল ক্ষেত্রে বহু সভ্য-অসভ্য মানুষের বর্ণাশ্রমাচার এবং এর উদ্দেশ্য সংঘর্ষ সৃষ্টি নয়, সংঘর্ষ নিবারণ। (অনুচ্ছেদ ১৫৫—৬১)

অপেক্ষাকৃত অনুন্নত জাতিকে উন্নত করবার সামর্থ্য ইউরোপের নেই। দুর্বলকে সমূলে ধ্বংস করাই তাদের কাজ। কোনোদেশেরই ওরা উপকার করেনি, বরং ক্ষতিই করেছে। উদাহরণ—অষ্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, প্যাসিফিক্ দ্বীপপুঞ্জ, আফ্রিকা ইত্যাদি দেশ। আদিম জাতিদের ইউরোপ ধ্বংস করেছে। যেখানে শক্তি নেই, সেখানেই শুধু অন্যজাতিকে বাঁচতে দিয়েছে। ভারত কিন্তু এমন করেনি। আর্যরা ছিলো অত্যন্ত দয়ালু ; প্রমাণ, বর্ণাশ্রম সৃষ্টি। ইউরোপীয়দের মতো সবাইকে ধ্বংস করে নিজের বাঁচা নয়, সবাইকে নিজেদের সমান বা নিজেদের চেয়ে বড়ো করবার ব্রত নিয়ে বাঁচাই আর্যদের রীতি। ইউরোপীয়দের উপায় তলোয়ার, আর্যদের উপায় বর্ণবিভাগ। ইউরোপে বলবানের জয়, দুর্বলের মৃত্যু ; ভারতবর্ষের সামাজিক বিধি দুর্বলকে রক্ষা করা। (অনুচ্ছেদ ১৬২ — ১৬৫)

সভ্যতার উন্নতি বলে ইউরোপ যেটার গর্ব করে, তা মূলতঃ অনুচিতকে উচিত করা, চুরি, মিথ্যাচার, ঔচিত্য বিধানের নামে অন্যের বিনষ্টিকরণ, ব্যভিচার ইত্যাদি। খ্রীষ্টানী ও ইসলামী ধর্মে মানবজাতির

উন্নতি সম্বন্ধে তুলনা করলে দেখা যায়, খ্রীষ্টধর্ম প্রথম তিন শতাব্দী বিশ্বের সামনে নিজেদের পরিচিত করাতে সমর্থ হয়নি। ঐ ধর্ম আধ্যাত্মিক বা সাংসারিক সভ্যতা বিস্তারে কোন সহায়তাই করেনি। ইউরোপীয় যে পণ্ডিত পৃথিবীকে সচলা বলেছিলেন, খ্রীষ্টধর্ম তাকে কঠোরভাবে শাস্তি দিয়েছিলো। বিজ্ঞান ও বিদ্যাকে সর্বদাই খ্রীষ্টধর্মের সঙ্গে বিরোধিতা করতে হয়েছে। আজও বৈজ্ঞানিকের ও বিদ্বানের পক্ষে খৃষ্টান হওয়া সম্ভব নয়। নিউ টেষ্টামেণ্টে বিজ্ঞান বা শিল্পের কোনো প্রশংসা নেই। যেটুকু আছে, তাও কোরাণের দ্বারা অনুমোদিত। ইউরোপের মনীষীরা খ্রীষ্টানদের দ্বারা তিরস্কৃত ও অভিশপ্ত। ইসলাম অবশ্য তাঁদের আস্তিক বলে মনে করেন, কেবল তাঁদের পয়গম্বর-বিশ্বাস নেই বলেই ক্ষোভ। ইসলাম যেখানে গিয়েছে, সেখানে আদিবাসীদের রক্ষা করেছে—ওদের ভাষা, ওদের জাতীয়তা রক্ষা পেয়েছে। খ্রীষ্টধর্ম এমন উদাহরণ দেখাতে পারে না। স্পেন, আরব, অষ্ট্রেলিয়া আমেরিকার আদিবাসীরা এখন কোথায়? ইউরোপে ইহুদীদের কী দশা হয়েছে? একমাত্র দান সংক্রান্ত কাজ ছাড়া কিছুই গস্‌পেলের অনুমোদিত নয়। ইউরোপে যা কিছু উন্নতি হয়েছে, সবকিছুই খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মধ্যে দিয়েই ঘটেছে। ঐ ধর্মের যদি তেমন শক্তি থাকতো, তাহলে একালের শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের মেরে ফেলতো। বর্তমান ইউরোপে খ্রীষ্টধর্ম ও সভ্যতা পৃথক্ জিনিস। বরং সভ্যতা এখন তার প্রাচীন শত্রু খ্রীষ্টধর্মের বিনাশের জন্যে সংগঠিত। কিন্তু মুসলমান দেশে যাবতীয় পদ্ধতি ইসলাম ধর্মের ওপরে সংস্থাপিত ও সেজন্য সম্মানিত।

(অনুচ্ছেদ ১৬৬—১৬৮)

পাশ্চাত্যদেশে এখন লক্ষ্মী-সরস্বতীর কৃপা একত্রে। শুধু ভোগের সামগ্রী নয়, সবকিছুরই একটা সচ্ছবি এরা চায়। আমাদের দেশেও ঐভাব একদিন ছিলো, যখন ধন ছিলো। এখন দারিদ্র্য আমাদের

জাতীয় গুণগুলি বিনষ্ট করছে এবং পাশ্চাত্য দেশেরও কিছু পাচ্ছিনা। চাল-চলনে আমাদের পুরোনো রীতি যেমন নষ্ট হয়েছে, পাশ্চাত্য রীতি গ্রহণের সামর্থ্যও নেই। পূজাপাঠ, শিল্পকলা, পুরাণাদি সবই ভেসে গেছে। বিদেশীদের প্রবর্তিত যন্ত্রপাতির কাজ আমাদের গ্রাম্য হাতের কাজের চেয়ে অনেক নিকৃষ্ট। অথচ সেই সব গ্রাম্য কাজের ব্যাপারে আমাদের রয়েছে উন্নাসিক দৃষ্টি। এখন আমাদের পুঁথিপড়া আর বাক্যবিলাস ব্যতীত আর কিছুই নেই। এইদিক থেকে বাঙালীর সঙ্গে আইরিশদের মিল আছে। কাজের বেলায় নেই, কেবল বক্তৃতাবাজী ও দলাদলি। (অনুচ্ছেদ ১৬৯)

ওদেশে সব কিছুই পরিষ্কার সাজানো গোছানো। ওদেশের খুব দরিদ্রও এদিকে সচেতন থাকে। পরিচ্ছন্ন পোষাক না হলে কেউ কাজ পাবে না। ওদের ঘরদোর সর্বদাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ময়লা আবর্জনা একস্থানে জমিয়ে সবশুদ্ধ অনেক দূরে নিয়ে গিয়ে ফেলে। রাস্তাঘাটে কোনো ময়লা নেই। ওদেশের ধনীদের বাড়ীঘর দেখার মতো। দেশবিদেশ থেকে নানাপ্রকার শিল্পদ্রব্য সংগ্রহ করে এরা সাজিয়ে রাখে। সে সামর্থ্য আমাদের নাই বা থাক, যা ধ্বংস হচ্ছে, তা রক্ষা করা যেতে পারে। চিত্র বা ভাস্কর্যে আমরা কখনো ওদের কাছাকাছি পৌঁছোতে পারবো না। ওতে চিরকালই আমরা অপটু। বড়োজোর ওদের অনুকরণ করে রবি বর্মার মতো শিল্পী জন্মায়। তার চেয়ে বরং দেশী চালচিত্রকার পটুয়ারা অনেক ভালো।

(অনুচ্ছেদ ১৭০—১৭১)

১৫

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থের প্রসঙ্গগত তথ্য—নির্দেশ

স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটি 'উদ্বোধন' পত্রিকার দ্বিতীয় ও তৃতীয়বর্ষে (১৩০৬—০৮ সাল) ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের তুলনামূলক প্রসঙ্গ এই গ্রন্থটিতে স্থানলাভ করেছে। গ্রন্থাকারে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' প্রকাশিত হয় ১৩০৯ সালে।

গ্রন্থটি প্রসঙ্গে প্রকাশক প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় লিখেছেন,—"ইহাতে শ্রীমৎ স্বামীজীর গভীর মনস্বিতা ও ভূয়োদর্শনের বিশিষ্ট পরিচয় রহিয়াছে। আমাদের সমাজে দুই শ্রেণীর লোক দেখিতে পাওয়া যায় ; একদলের মতে পাশ্চাত্যের যাহা কিছু সবই নিখুঁত ও সর্বাঙ্গ সুন্দর ; দেশী জিনিসের মধ্যে আদৌ দেখিবার বা ভাবিবার বিষয় কিছুই নাই। অপর দল ইহার ঠিক বিপরীত মতাবলম্বী, হিন্দুদের এবং হিন্দু সমাজের যে কোন-কিছু দোষের থাকিতে পারে, তাহা একেবারেই অসম্ভব বিবেচনা করেন ; আর যে পাশ্চাত্য জাতি ও পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ সমস্ত পৃথিবীময় আপনার রাজত্ব বিস্তার করিতে বসিয়াছে, তাহাদের নিকট হইতে আমাদের যে কিছু শিখিবার আছে, ইহা তাঁহারা কল্পনায়ও আনতে পারেন না। এই প্রবল স্রোতের ঘাত-প্রতিঘাতে হিন্দুসমাজ আত্মহারা হইতে বসিয়াছে।'

পরিশেষে প্রকাশক তাঁর আশা ব্যক্ত করেছেন,—'স্বামীজীর

এই প্রবন্ধ চিন্তাশীল ব্যক্তিগণের চিন্তাস্রোত যথার্থ পথে প্রবাহিত করাইয়া দিবে, এই আশা করিয়া ইহার পুনর্মুদ্রণ করা গেল।"

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপনে প্রকাশকের কিছু মূল্যবান্ উক্তি স্মরণীয়। তিনি লিখেছেন,—"স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হইতে আমাদের দৃষ্টি নিজ দেশের প্রতি কিছু আকৃষ্ট হইয়াছে বটে, কিন্তু স্বদেশ ভক্তির মূলভিত্তি সম্বন্ধে এবং পাশ্চাত্যদেশ হইতেই বা কিরূপে তাহাদের কি কি গুণ গ্রহণ করিলে আমাদের জাতীয় উন্নতি হইতে পারে, তৎসম্বন্ধে সাধারণের একটা পরিষ্কার ধারণা নাই। কেহ কেহ পাশ্চাত্য জাতির উপর অযথা বিদ্বেষ-সম্পন্ন হইয়া উঠিতেছেন। আশা করি স্বামীজীর এই নিরপেক্ষ সমালোচনাগ্রন্থ দ্বারা লোক-শিক্ষার বিশেষ সহায়তা হইবে।"

প্রকাশকের বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে স্বামী বিবেকানন্দের উক্ত গ্রন্থরচনার উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে অভিব্যক্ত হয়েছে।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বামী বিবেকানন্দের 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটির নিম্নোক্ত দিক থেকে মূল্য আছে।—

(ক) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দুই জীবনাদর্শের আচার-বিচার অশন ভূষণ থেকে আরম্ভ করে আধ্যাত্মিক পরম লক্ষ্য অবধি উভয় সভ্যতার তুলনামূলক আলোচনায় আজ পর্যন্ত অদ্বিতীয় গ্রন্থ বলা যেতে পারে।

(খ) ওজস্বিতা, প্রসাদগুণ, নিপুণ বিশ্লেষণ, বুদ্ধিদীপ্ত বাগ্‌ভঙ্গী, বিদগ্ধ পরিহাস এবং ভারতাত্মার গভীর ধ্যানসত্যের মিশ্রণে বাংলা-গদ্যের চিরোজ্জ্বল আদর্শসৃষ্টির নিদর্শনরূপে 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটি স্বামী বিবেকানন্দের অক্ষয় কীর্তি।

(গ) সাধারণতঃ প্রবন্ধ বলতে যা বোঝায়, 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' তার চেয়েও অনেককিছু। 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' অনেক পরিমাণে ব্যক্তিত্ব সুরভিত রচনা।

(ঘ) পরাধীন জাতির আত্মসম্বিৎ ফিরে পাবার জন্যে প্রয়োজন ছিল স্বকীয় সাধনা ও আত্মবিশ্বাসের। বঙ্কিমচন্দ্র থেকে বিবেকানন্দ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে সেই আত্মবিশ্বাসের উদ্বোধনের পালা।

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যায়ণ প্রসঙ্গে সমালোচক যে দিকগুলি ইঙ্গিত করেছেন, পূর্বোক্ত মন্তব্য তারই নির্যাস।

'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য' গ্রন্থটির কিছু প্রসঙ্গগত তথ্য প্রয়োজনবোধে সুপরিস্ফুট করা হলো। এ বিষয়ে বেলুড় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠের অধ্যক্ষ এবং 'উদ্বোধনের' প্রকাশক মহাশয়ের কাছে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ ঋণ-স্বীকার করি। তাঁদের প্রকাশিত তথ্যপঞ্জী তথ্যনির্দেশের বিষয়ে যথেষ্ট সহায়তা করেছে।

ধর্ম ও মোক্ষ: ধর্ম ও মোক্ষ আমাদের চতুর্বর্গ সুখরূপ চরম অভীষ্টের সাধক। পুরুষার্থের জন্যেই জীব প্রবৃত্ত এবং ক্রিয়াশীল হয়। চতুর্বর্গে বিবেকী পুরুষের প্রবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। 'ধর্ম' সব পুরুষার্থেরই সাধক বলে তাকে প্রাধান্য দেবার জন্যে প্রথমে তার স্থান দেওয়া হয়, একথা অনেকে বলেন। ধর্ম বেদবিহিত কর্মের অনুষ্ঠান থেকে উৎপন্ন আত্মার গুণাত্মক সংস্কার। মীমাংসকদের মতে ধর্ম শব্দের অর্থ পুণ্যকর্ম যাগ-যজ্ঞাদি—যার দ্বারা ইহলৌকিক মঙ্গল ও পরলোকে স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটে থাকে। 'মোক্ষ'—বিষয়ের সম্পর্কশূন্য আত্মার নিত্যসুখের কারণীভূত দশা। আত্মা নিত্য ও তদ্‌গত সুখও নিত্য। কিন্তু বিষয়ের সংসর্গে তা তিরোহিত বা অনুপলব্ধ থাকে। বিষয় থেকে চিত্ত যখন আত্যন্তিকভাবে নিবৃত্ত হয়, তখন প্রকৃতি বা আত্মায় লীন হয়ে যায়। তখন নিরুপাধি 'মোক্ষসুখের' অভিব্যক্তি ঘটে। সুতরাং দেখা যাচ্ছে, 'মোক্ষ' শব্দটির অর্থ সব বন্ধন থেকে মুক্তি বা আত্যন্তিক দুঃখনিবৃত্তি। বেদান্ত মোক্ষসাধনাকেই পরম সাধনা বলে অভিহিত করেছেন। এই চরম পুরুষার্থ ব্রহ্মজ্ঞান না হলে লাভ করা যায় না। এর জন্যে সব রকম ঐহিক ভোগ পরিত্যাগ করতে হয়।

সাম-দান-ভেদ দণ্ড ঃ রাজার নিজস্ব পালনীয় কিছু ধর্ম আছে। রাজনীতির ক্ষেত্রে রাজধর্মের অন্তর্গত চারটি নীতি আছে। সাম-নীতিতে রাজা, পরস্পর অনিষ্ট চিন্তা না করে বরং সহায়তা করবো—এই ধরনের প্রতিজ্ঞার মাধ্যমে শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করেন। দান নীতিতে প্রবল বা দুরন্ত শত্রুর সন্তোষ বিধান করবার জন্যে এবং অনুকূল না হলেও তাকে নিরপেক্ষ রাখবার জন্যে রাজা অর্থ বা গ্রামাদি দান করেন। ভেদনীতির বিষয়ে কৌটিল্যের ব্যাখ্যা—শঙ্কা উৎপাদন, ভীতিপ্রদর্শন বা সন্দেহ আনয়নের রাজনীতি। শুক্রনীতির মতে,—প্রবল শত্রুর আশ্রয় গ্রহণ এবং অপেক্ষাকৃত হীন ব্যক্তিকে প্রবলীকরণ দণ্ডনীতি সম্পর্কে ব্যাখ্যা অনাবশ্যক। মনুসংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থে রাজাচরণীয় প্রসিদ্ধ নীতিচতুষ্টয়ের উল্লেখ আছে।

আম্নায়স্য ক্রিয়ার্থত্বাদ্ আনর্থক্যম্ অতদর্থানাম্ ঃ বেদের দুইটি কাণ্ড আছে। একটি,—কর্মকাণ্ড, অন্যটি,—জ্ঞানকাণ্ড। পূর্বমীমাংসাবাদীরা কর্মকাণ্ডে বিশ্বাসী। তাঁদের মত এই যে আম্নায় (আ—ম্না=অভ্যাস করা+অ—কর্মে) বা বেদের যে অংশে ক্রিয়া বা যজ্ঞাদির কথা উল্লেখ রয়েছে, সেই অংশই সত্য। যেক্ষেত্রে তা অনুপস্থিত, তা হলো অনর্থক বা অপ্রমাণ। তাঁদের মতে, সুতরাং, 'অহং ব্রহ্মাস্মি' কিংবা 'সোঽহম্ অস্মি' ইত্যাদি বাক্যগুলি নিরর্থক। মীমাংসা দর্শনের ১।২।১ সূত্রে মতবাদ পরিস্ফুট।

মুক্তিকামের ভাল অন্যরূপ ও ধর্মকামের ভাল আর এক প্রকার ঃ বেদের জ্ঞানকাণ্ডকে যারা মূল্য দিয়ে থাকেন অর্থাৎ জ্ঞানমার্গীরা হলেন মুক্তিকাম বা মোক্ষকাম। তাঁরা সব কিছু বন্ধন থেকে মুক্তি পেয়ে আত্মোপলব্ধি করতে চান। কিন্তু ধর্মকাম ঐহিক এবং পারত্রিক—উভয় প্রকার সুখ লাভ করতে ইচ্ছুক।

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ঃ গীতার চতুর্দশ অধ্যায়ে এই তিন গুণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা আছে। সেখানে বলা হয়েছে,—

সত্ত্বং রজস্তমো হোতে গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ।
নিবধ্নন্তি মহাবাহো দেহে দেহিনমব্যয়ম্॥ ৫ ॥
তত্র প্রকাশকং সত্ত্বং নির্মলত্বাদনাময়ম্।
সুখসঙ্গেন্ বধ্নাতি জ্ঞানসঙ্গেন চানঘ ॥ ৬ ॥
রজো রাগাত্মকং বিদ্ধি তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভবম্।
তন্নিবধ্নাতি কৌন্তেয় কর্মসঙ্গেন দেহিনম্॥ ৭ ॥
তমস্ত্বজ্ঞানজং বিদ্ধি মোহনং সর্বদেহিনাম্।
প্রমাদালস্যনিদ্রাভি স্তন্নিবধ্নাতি ভারত ॥ ৮ ॥

পূর্বোক্ত শ্লোকের অর্থ—

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ, প্রকৃতিসম্ভব এই গুণগুলি অবিকারী দেহীকে দেহে আবদ্ধ করে। হে নিষ্পাপ! নির্মলত্ববশতঃ প্রকাশক ও দুঃখশূন্য সত্ত্বগুণ সুখ ও জ্ঞানের সঙ্গে দেহীকে আবদ্ধ করে। রজোগুণকে রাগাত্মক ও তৃষ্ণাসঙ্গসমুদ্ভব জানবে। রজোগুণ দেহীকে কাম্যকর্মে আবদ্ধ করে। এবং, তমোগুণের উদ্ভব হয় অজ্ঞান থেকে। তমোগুণকে সমস্ত প্রাণীর বুদ্ধিনাশক হিসেবে জানবে। এই গুণ বুদ্ধিভ্রম আলস্য এবং নিদ্রাদ্বারা দেহীকে আবদ্ধ করে।

উপায় হচ্ছে বৈদিক উপায়,—'জাতিধর্ম', 'স্বধর্ম' যেটি বৈদিক ধর্মের, বৈদিক সমাজের ভিত্তিঃ জাতিধর্ম বা স্বদেশধর্ম বলতে বিবেকানন্দ গীতায় উক্ত স্বধর্মের কথা বলেছেন। সেখানে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের কর্মাদি বিভাগ দেখানো হয়েছে। গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ে আছে,—

ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়াণাঞ্চ শূদ্রাণাঞ্চ বিশাস্তথা।
কর্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈ গুণৈঃ ॥ ৪১ ॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জবমেব চ।
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্॥ ৪২ ॥

শৌর্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্।
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্॥ ৪৩॥
কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যং বৈশ্যকর্ম স্বভাবজম্॥ ৪৪॥
কর্মণ্যভিরতঃ স্বে স্বে সংসিদ্ধিং লভতে নরঃ।
স্বকর্মনিরতঃ সিদ্ধিং যথা বিন্দতি তচ্ছৃণু॥ ৪৫॥
প্রবৃত্তি র্যত্র ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ॥ ৪৬॥

পূর্বোক্ত শ্লোকের অর্থ,—

ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্রগণের কর্মসমূহ প্রকৃতিজাত অর্থাৎ সত্ত্ব রজঃ তমঃ গুণ অনুসারে বিভিন্ন। শম, দম, তপস্যা, শৌচ, ক্ষমা, সরলতা, জ্ঞান, বিজ্ঞান ও আস্তিক্য—এইগুলি হচ্ছে ব্রাহ্মণের প্রকৃতি-জাত কর্ম। শৌচ, তেজ, ধৃতি, দক্ষতা, যুদ্ধে অ-পলায়ন, দান এবং ঈশ্বরভাব—এগুলি হচ্ছে ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম। কৃষি গোপালন ও বাণিজ্য বৈশ্যদের স্বভাবজ কর্ম; এবং শূদ্রের স্বভাবজাত কর্ম হচ্ছে সেবা। মানুষ তাদের নিজ নিজ কর্তব্যে নিষ্ঠাবান্ হয়ে সিদ্ধিলাভ করে। যাঁর থেকে জাত সমূহের উৎপত্তি, যিনি সর্বত্রই ব্যাপ্ত, মানুষ তার কর্তব্য-কর্ম-দ্বারা তাঁর অর্চনা করে সিদ্ধিলাভ করে।

রাজা জোর করে টাকা আদায় করতে গিয়ে মহাবিপ্লব উপস্থিত করলেন; রাজাকে মেরে ফেল্‌লে: ইংল্যাণ্ডের রাজা প্রথম চার্লস্ প্রজাদের ওপরে বলপ্রয়োগে করভার চাপিয়ে এবং তা আদায় করতে গিয়ে ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে আগষ্ট গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটান। এই সময়ে সাধারণের ক্ষোভের একটি চিত্র দিতে গিয়ে H. A. L. Fisher তাঁর A History of Europe গ্রন্থে লিখেছেন,—

"As it was they grudged every penny. Their

parsiwony drove Charles co unconstitutional expedients for raising funds—to ship money, to forced loans and eventually to a quarrel so hot that it led to a suspension of parliamentary government for ten years." (The great Rebelion in England).

প্রজাপুঞ্জের অসন্তোষের পরিণাম ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দের ৩০শে জানুয়ারী প্রথম Charles-এর শিরশ্ছেদ। Fisher-এর বর্ণনা :

"When Cromwell returned from the north, after the battle of Preston, his mind was attuning itself to the deliberate resolve of the army that 'the man of blood' must be removed, and sweeping pralia mentary obstacles from his path by the brusque method of Pride's Purge, he brought the king to the final scene before Palace at Whitehall, which recalled the English people to their royal faith, and gave to Charles the Martyr, dying like a great English gentleman and a saint, a final absolution from his many faulti."

জাহাঙ্গীর, সাজাহান, দারাসেকো, এদের সকলের মা যে হিন্দু : আকবর ভারতীয় হিন্দুদের সঙ্গে বিশেষ করে রাজপুতনার হিন্দুদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করে তাঁর রাজনৈতিক কর্মধারাকে সাবলীল করতে চেয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও মোঘল রাজবংশে হিন্দুমাতার আগমন ঘটেছে। জাহাঙ্গীরের মা ছিলেন অম্বররাজ বিহারীমলের কন্যা যোধবাঈ। দারাসিকো ও আওরঙ্গ-জেবের মা মমতাজ অবশ্য মুসলমান ছিলেন।

আওরঙ্গজেব আবার ঐখানটায় ঘা দিলে : আওরঙ্গজেব উন্নত

চরিত্রসম্পন্ন এবং স্বধর্মে নিষ্ঠাবান্ হলেও সাম্প্রদায়িকতা ও অনুদারতা তাঁর একটি প্রধান দোষ ছিল।

পাদরী-পুঙ্গবেরা একটু আধটু চেষ্টা করেই ত '৫৭ সালের হাঙ্গামা উপস্থিত করেছিল : '৫৭ সালের হাঙ্গামা বলতে এখানে প্রাবন্ধিক ১৯৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সিপাহী যুদ্ধের কথা উল্লেখ করতে চেয়েছেন। সিপাহীযুদ্ধ সম্পর্কে ইংরেজদের প্রচার এবং আমাদের রাজভক্তি ও শাসকভীতি সিপাহী বিপ্লবকে 'হাঙ্গামা' হিসেবেই দেখতে প্রেরণা দিয়েছিলো। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসের শেষে ব্যারাকপুরে মঙ্গল-পাণ্ডের বিক্ষোভে এই বিপ্লবের সূচনা এবং ঐ বছরের ১০ই মে মীরাটে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের মধ্যে এই বিপ্লবের পূর্ণ আত্মপ্রকাশ। সিপাহী বিপ্লবের মূলে কতকগুলি কারণ ছিলো। রাজনৈতিক কারণ—লর্ড ডালহৌসী অনুসৃত ব্রিটিশ সাম্রাজ্য সম্প্রসারণের নীতি, মোঘল সম্রাটের বংশধরদের প্রতি অসম্মানজনক ব্যবহার, পেশোয়ার দত্তকপুত্র নানাসাহেবের বৃত্তির বিলোপসাধন ইত্যাদি। অর্থনৈতিক কারণ—কিছু সংখ্যক ভূস্বামীর উচ্ছেদ, সাতারা নাগপুর ইত্যাদি রাজ্যের বিলোপের ফলে অনেকের কর্মচ্যুতি, ডালহৌসী নিয়োজিত ইনাম কমিশনের তদন্তের ফলে দাক্ষিণাত্যে বহু জমি বাজেয়াপ্ত, অযোধ্যা অধিকারের ফলে ব্যাপক বেকার সমস্যার সৃষ্টি ইত্যাদি। ধর্মীয় এবং সামাজিক কারণ পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও বিস্তৃতি, বিধবা বিবাহ আইন প্রবর্তন, খ্রীষ্টান মিশনারীদের উগ্র তৎপরতা এবং চর্বিযুক্ত কার্তুজ সম্বলিত এন্‌ফিল্ড রাইফেলের প্রবর্তন।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীতে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর সংখ্যাধিক্য ছিলো এবং প্রকৃত কারণভিত্তিক ওঅসঙ্গত কল্পনাভিত্তিক অসন্তোষ এদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে ওঠে। বিবেকানন্দ ধর্মীয় ও সামাজিক কারণটিই ইঙ্গিত করেছেন। খ্রীষ্টান পাদ্রীরা বিভিন্ন

উপায়ে এদেশীয় হিন্দু-মুসলমানকে ধর্মান্তরিত করবার চেষ্টা করেছে এবং ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যেও তারা তাদের কার্যকলাপ প্রসারিত করে। তাছাড়া এমন অভিযোগ কেউ কেউ করেন যে, হিন্দুদের ধর্মীয় ও সামাজিক নানাবিধ সংস্কারে হস্তক্ষেপ করবার জন্যে তাঁরা ইংরেজ সরকারকে প্ররোচিত করতেন সেযুগে।

লর্ড রবার্টসের 'ভারতবর্ষে ৪০ বৎসর' নামক পুস্তক পড়ে দেখ: উক্ত লেখকের গ্রন্থ Forty-one years in India গ্রন্থের ৩০শ ও ৩১শ অধ্যায় এ প্রসঙ্গে স্মরণ করা চলে। স্বামী বিবেকানন্দ ৪১ বৎসরের বদলে অসর্তকতাবশতঃ ৪০ বৎসর লিখেছেন।

ভেড়িয়া ধসান: শুদ্ধ ভাষায় যাকে 'গড্ডলিকা প্রবাহ' বলে (অপভ্রংশে গড্ডালিকা প্রবাহ), চলিত কথায় তাকেই 'ভেড়িয়া ধসান' বলা হয়। অধিকাংশ মেষ নির্দ্বিধায় প্রথম মেষের কার্যধারা অনুসরণ করে।

গোরস্ গলিগলি ফিরে সুরা বৈঠ বিকায়। সতীকো না মিলে ধোতি কসবিন্ পেহনে খাসা: তুলসীদাসের একটি কবিতা বা গানের অংশ। এর অর্থ—গলিতে গলিতে দুধ ফেরি করে বেড়াতে হয়, অথচ মদ এক জায়গাতে বসে বিনাশ্রমেই বিক্রী করা যায়। সতী নারীর পরনের সামান্য কাপড় জোটে না, আর চরিত্রহীনা নারী সুবেশ পরে ঘুরে বেড়ায়। কলিযুগের বৈশিষ্ট্যের কথাই সন্ত তুলসীদাস বলতে চেয়েছেন।

য়োনিয়া (Ionia): ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত গ্রীসের অন্তর্ভুক্ত দ্বীপপুঞ্জ। শিলালেখে 'যোন' জাতির উল্লেখ আছে। সম্রাট অশোক গ্রীক রাজাদের কাছে বৌদ্ধধর্ম প্রচারক পাঠিয়েছিলেন। অনেকের অনুমান গ্রীকদেরই 'যবন' (Ionian) বলা হতো। বর্তমানে অর্থ-পরিবর্তনের ফলে মুসলমানদের 'যবন' বলা হয়ে থাকে—সে ভারতীয় বা বাঙালী হলেও।

যখন তৃতীয় নেপলেঁও ফরাসী দেশের বাদশা ছিলেন, তখন সাম্রাজ্ঞী অজেনি পাশ্চাত্য জগতের বেশভূষার অধিষ্ঠাত্রী দেবী: প্রথম নেপলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র লুই নেপোলিয়ন ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের দ্বিতীয় রিপাবলিকের প্রেসিডেণ্ট হন। ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'তৃতীয় নেপোলিয়ন' উপাধি ধারণ করে ফরাসী সম্রাট হন। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ফরাসী সাম্রাজ্যের সম্রাট ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অজেনি-কে (Eugénie de Montijo) বিবাহ করেন। আজেনি-সম্পর্কিত তথ্য:

'Eugénie (1326—1920) was the daughter of Count Montijo of granada, and on the mother's side of scottish descount. She married Napoleon III in 1953, and for many years kept a brilliant court. On the outbreak of the Franko-prussian war her husband and only son proceed to the seat of war with great flowrish of trumpets, but after sedan the Empress had to make her escape from paris in disguise, and took up her abode in England, where she was subsequently joined by Louis Napoleon. They resided at chisle hurst for the time, and there her husband died. Her son went out to the zulu war in 1879, and was killed by a party of zulus. When in England the Empress resided at Farnborough Hill, Hants.

আচার: প্রথমো ধর্ম: উদ্ধৃতি অসতর্কিত। পূর্ণাঙ্গ শ্লোকটি মনুসংহিতার প্রথম অধ্যায়ে আছে।—

'আচারঃ পরমো ধর্মঃ শ্রুত্যুক্ত স্মার্ত এব চ।
তস্মাদস্মিন্ সদা যুক্তোনিত্যং স্যাদাত্মবান্ দ্বিজ ॥ ১০৮ ॥

অর্থ : পরম্পরাগত আচার যে উৎকৃষ্ট ধর্ম, তা শ্রুতি বা স্মৃতি উভয়ের মধ্যেই প্রতিপাদিত হয়েছে। অতএব আত্মহিতাভিলাষী ব্রাহ্মণ শ্রুতি স্মৃতি বিহিত আচারের অনুষ্ঠানে সতত যত্নবান্ থাকবেন।

'র‍্যাতন না জানলে বোদ্র অবোদ্র বুঝবো ক্যামনে ? : বেতন না জানলে ভদ্র বা অভদ্র এটা কী করে নির্ধারণ করা যাবে ? দীনবন্ধু মিত্র রচিত 'সধবার একাদশী' প্রহসনের থেকে এই উক্তিটি নেওয়া হয়েছে। সে সময়ে অভিনয়ের মাধ্যমে 'সধবার একাদশী' অত্যন্ত জনপ্রিয় প্রহসন হয়ে উঠেছিলো। প্রহসনটির অনেক সংলাপ লোকের মুখে মুখে ফিরতো।

চীনে কনফুচের চেলা : চীন দেশের প্রাচীন সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত একটি নাম কনফুশিয়স। ইনি চীন দেশের দার্শনিক। ধর্মগুরু ও রাষ্ট্রনৈতিক চিন্তাবিদ্ ছিলেন। তাঁর পারিবারিক নাম ছিল খুঙ্। কন্‌ফুসিয়স্ হলো 'খুঙ্-ফু-ৎসে' শব্দের লাতিন রূপ। 'খুঙ্-ফু-ৎসে' শব্দের অর্থ 'শিক্ষক খুঙ্'। শিক্ষাকে সমাজ সংস্কারে লাগানোর জন্য কন্‌ফুসিয়স অত্যন্ত আগ্রহী ছিলেন। রাষ্ট্রনীতিকে তিনি নীতিশাস্ত্রের প্রয়োগক্ষেত্র মনে করতেন।···চরিত্রের অকৃত্রিমতা তাঁহার মতে আদর্শ ছাত্রের আবশ্যিক গুণ। বিদ্যাশিক্ষার মূল ভিত্তি হইল নীতিজ্ঞান ; ছাত্রের অন্তরে নীতিবোধ জাগাইয়া তাহাকে পূর্ণাঙ্গ মানুষ করিয়া তোলাই ছিল কন্‌ফুসিয়সের ধর্ম।' (ভারত কোষ ২য় খণ্ড) কন্‌ফুশিয়সের নীতিবোধের প্রভাব পরবর্তীকালে জাতিকে গোঁড়া নীতিপন্থী করে গড়ে তুলেছিলো।

মুসলমান আরবমিশ্র মূরেরা, যখন তারা স্পেন বিজয় করে আট শতাব্দী রাজত্ব করে, সেই সময় : ৭১১ খৃষ্টাব্দে মুসলমান সেনাপতি তারিক্ স্পেন দেশ জয় করেন। মুসলমান শাসকরা সেখানে ১৯৪২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

এই ফ্রাঁস প্রাচীনকাল হতে গোনওয়া (ganlois), রোমক, ফ্রাঁ (Franks) প্রভৃতি জাতির সংঘর্ষ ভূমি : ৫৮—৪১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে জুলিয়াস সীজার 'গল' দেশ এবং সেখানকার বহু স্বাধীন জাতিকে রোম সাম্রাজ্যের অধীনে এনেছিলেন। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রোম থেকে গলে খ্রীষ্টধর্ম বিস্তার লাভ করে। যে সময় রোম সাম্রাজ্যের পতন হয়, তখন বহু বর্বর জাতি গল আক্রমণ করে। তাদের মধ্যে ফ্রাঁ জাতির নেতা ক্লোভিসের (৪৬৬—৫১১) নাম উল্লেখ করা যায়। তিনি ৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রোমের ক্ষমতা ধ্বংস করেন এবং এক বৃহৎ ফ্রাঁ রাজ্য স্থাপন করেন। তারপর থেকেই গলদেশের নাম হয় ফ্রাঁস।

এদের বাদসা শার্লামাঞ্ন ইউরোপে কৃশ্চান ধর্ম তলোয়ারের দাপটে চালিয়ে দিলেন : শার্লামাঞ্ন বা Charlemagne মহামতি চার্লস্ বা Charles the great নামেও খ্যাত। চার্লস্ ৭৬৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ৮৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেছিলেন। ইউরোপে মধ্যযুগে যে রাজারা ছিলেন, তাঁদের মধ্যে তিনি ছিলেন মহান্। এইজন্যে তিনি Charles the great। ৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের পদ শূন্য হলে ৮০০ খৃষ্টাব্দে পোপ দ্বিতীয় লিও তাঁকে Holy Roman Emperor উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। গল, ইটালি এবং স্পেন ও জার্মানীর একটি বৃহৎ অংশ চার্লসের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিলো। চার্লস্ এখানে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে সহায়তা করেন।

মহাবল পারস্য আরবের পদানত হল : হজরত মোহম্মদের নেতৃত্বে (৫৭০—৬৩২ খ্রীঃ) যাযাবর আরবজাতি ইসলামধর্মে দীক্ষিত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে ওঠে। মাত্র ১০০ বৎসরের মধ্যেই এই জাতি দুর্ধর্ষ হয়ে ওঠে। ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এই জাতি কাদোসিয়ার যুদ্ধে পারস্যদেশকে পদানত করে।

এর নাম রেনেসাঁস (Renaissance) নবজন্ম : ধর্মযুদ্ধ বা Crusade-এর মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টান জাতিগুলির সঙ্গে মুসলমান জাতির সংসর্গ হয়। ফলে ইউরোপে দর্শন বিজ্ঞান ইত্যাদির উন্নতি হয়। এই উন্নতির সূচনা ঘটে খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী কিংবা আরও কিছু পূর্ব থেকে ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীজাতি কন্‌স্টান্টিনোপল দখল করে। তখন সেখান থেকে বড়ো বড়ো পণ্ডিত এসে ইটালিতে বসবাস করতে থাকেন। এর ফলেই প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার আলোক সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। মধ্যযুগে বিভিন্ন কারণে এই দুই প্রাচীন সভ্যতার কথা ইউরোপীয়রা প্রায় বিস্মিত হয়েছিলো। রেনেসাঁসের সময় থেকে ইউরোপে আধুনিকতার সূত্রপাত হয় এবং এই গণ-জাগরণের ফলে ইউরোপে স্থাপত্য, চিত্রকলা, সাহিত্য ইত্যাদির পুনরুজ্জীবন ঘটে।

স্কটরাজ ইংলণ্ডের রাজা হলেন : ১৬০৩ খৃষ্টাব্দে রাণী প্রথম এলিজাবেথের মৃত্যু হয়। তারপর স্কটল্যাণ্ডের রাজা ষষ্ঠ জেম্‌স্‌ 'প্রথম জেম্‌স্‌' নাম ধারণ করে ইংল্যাণ্ডের রাজা হন। এই প্রথম জেম্‌স্‌ থেকেই ইংল্যাণ্ডে স্টুয়ার্ট রাজবংশের সূচনা হয়। স্টুয়ার্ট রাজারা ১৭১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ড শাসন করেন।

স্কটরাজ স্টুয়ার্ট বংশের সময় ইংলণ্ডে রয়াল সোসাইটি প্রভৃতির সৃষ্টি : রয়াল সোসাইটির সৃষ্টি হয় ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে, তখন ইংলণ্ডে রাজা ছিলেন স্টুয়ার্ট বংশের দ্বিতীয় চার্ল্‌স্‌।

'এগালিতে, লিবার্তে, ফ্রাতের্নিতে'র (Egelite liberte fraternite) ধ্বনি ফ্রাঁস হতে চলে গেছে : ফরাসী বিপ্লবের মূলমন্ত্র ছিলো তিনটি শব্দ—সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা।

ফরাসী বিপ্লব : ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে ষোড়শ লুইয়ের সময়ে ফরাসী বিপ্লবের সূচনা হয়। এই বিপ্লব প্রথমে ছিলো সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। পরে রাজকীয় স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এই

বিপ্লবের গতি প্রবাহিত হয়। এই বিপ্লবকে মানবমুক্তি সংগ্রাম বলে অভিহিত করা হয়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ইউরোপে এই বিপ্লব ভাবধারা ও কর্মধারাকে প্রভাবিত করেছে।

প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি : গীতার তৃতীয় অধ্যায়ের থেকে শ্লোকাংশটি উদ্ধৃত হয়েছে। পূর্ণ শ্লোকটি এই,—

সদৃশং চেষ্টতে স্বস্যাঃ প্রকৃতেজ্ঞানবানপি।
প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি ॥ ৩৩ ॥

এর অর্থ :

বুদ্ধিমান ব্যক্তিও নিজের প্রকৃতিরই অনুরূপ কার্য করে। প্রাণিগণ প্রকৃতি অনুসারে চলে—দণ্ড বা নিষেধের দ্বারা কি ফল হবে।

প্রথম ন্যাপোলেঅঁ : ইতিহাস-খ্যাত বীর নেপোলিয়ন বোনাপার্ট। "Napoleon I (1769—1821) was born at Ajaccio in Carsica. Sent to France to receive a military education and was a Captain at the age of twenty. In 1794 served in Italy with such distinction that he won a generalship, and next year was appointed Commander-in-Chief. A series of most brilliant successes followed, He defeated the Austrian forces in 1797, conducted an expedition to Syria and Egypt in 1798, returned in 1799 to find himself the most popular man in France, and in November of that year he proclaimed himself First Consul. In 1800 he was again in Italy and once more victorious, In 1804 he was made Emperor and the following year was in the field against England, Russia and Austra, achieving a splendid

series of victories at Austerlitz and elsewhere, and practically become Dictator of Europe distributing kingships amongst his brothers in the most profuse manner Joseph becoming king of Naples, Louis king of Holland, and Jersme king of Westphalia. In 1809, after divorcing his first wife Josephine, he married Maria Lousia of Austria. Subsequently he made serious blunders. His invasion of Rusia was disastrous, the peninsular war went against him, and in 1814 the Allies enterid Paris and forced him to abdicate. He was sent to Elba, but made his escape in the following year, gathered his old army about him and went forth to meet the English and prussian armies. He was finally completely defeated at waterloo on the 18th June, 1815, and exiled to St. Helena, where he died six year later. His remains were removed to paris in 1840, and rest in a magnificant tomb."

একস্থানে প্রাচীন দুর্গ বাস্তিল (Bastille) ধ্বংসের স্মারক চিহ্ন : কারাগারে রূপান্তরিত ফরাসী দুর্গ বাস্তিল। ফরাসী বিপ্লবের সময়ে অর্থাৎ ১৪ই জুলাই, ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দে এক উন্মত্ত জনতা বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে সেখানে রক্ষিত বন্দুক ও গোলাবারুদ হস্তগত করতে এবং দুর্গকে ধূলিসাৎ করে অত্যাচারী শাসনের প্রতীক নষ্ট করতে উদ্যত হলো। কিছু কাল পূর্ব থেকেই এই দুর্গে বিনা বিচারে লোককে আটক রাখা হতো বলে বাস্তিল দুর্গটি অত্যাচারের প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হতো। জনতার আক্রমণে এই সময়ে

বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটেছিলো। অত্যাচারের প্রতীক নাশের মধ্যেই বাস্তিল দুর্গের পতনের গুরুত্ব নিহিত ছিলো। এখনো ১৪ই জুলাই ফরাসীদেশের জাতীয় দিবস হিসেবে পালিত হয়ে থাকে।

রাজা পালিয়ে যাচ্ছিলেন: ফরাসীরাজ ষোড়শ লুই (Louis XVI) আত্মরক্ষার জন্যে দেশত্যাগের সময় ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দের ২১শে জুন ভ্যারেনেস (Varennes) নামক স্থানে ধরা পড়েন।

রাজার শ্বশুর অষ্ট্রিয়ার বাদ্‌সা জামায়ের সাহায্যে সৈন্য পাঠাচ্ছেন: এই সময়ে অষ্ট্রিয়ার সম্রাট ছিলেন লিওপোল্ড। তিনি রাজার শ্বশুর নন। তিনি ছিলেন ষোড়শ লুইয়ের স্ত্রী মেরী এণ্টোয়নেটের ভাই।

'পরিত্রাণায়······বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্: গীতার চতুর্থ অধ্যায় থেকে প্রয়োজনীয় উদ্ধৃতি-অংশ দেওয়া হয়েছে। পূর্ণ শ্লোকটি সর্বজন বিদিত।—

পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃত্যম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

ভাগ্যলক্ষ্মী রাজ্ঞী জোসেফিন্‌কে ত্যাগ করলেন: প্রথম ন্যাপেলেওঁ প্রসঙ্গে প্রদত্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য। 'In 1809, after divorcing his first wife, Josephine, he married Maria Lousia of Austria.'

পুরান রাজার বংশের একজনকে তক্তে বসালে: নেপোলিয়নের পদত্যাগের পর ফ্রান্সের বুরবোঁ পরিবারের অষ্টাদশলুই সিংহাসনে স্থাপিত হয়েছিলেন।

মরা সিঙ্গি সে দ্বীপ থেকে পালিয়ে আবার ফ্রাঁসে হাজির হল: অষ্টাদশ লুইয়ের সিংহাসন লাভের সঙ্গে সঙ্গে 'ইমিগ্রি' অর্থাৎ রাজতন্ত্রে বিশ্বাসী দেশত্যাগী ফরাসী অভিজাত সম্প্রদায় ফ্রান্সে ফিরে এলো। কিন্তু তাদের ঔদ্ধত্যের ফলে অষ্টাদশ লুইয়ের উদার নৈতিক

শাসন ব্যবস্থার সুফল বিনষ্ট হলো। যুদ্ধকারী হাজার হাজার ফরাসী সৈন্য দেশে ফিরে নেপোলিয়নের অধীনে তাদের যুদ্ধজয়ের দিনগুলির কথা ভেবে আবার যুদ্ধের সুযোগ খুঁজতে লাগলো। কারণ যুদ্ধ করা একরকম তাদের স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছিলো। নেপোলিয়নের নাম ফ্রান্সের ঘরে ঘরে সশ্রদ্ধায় আবার উচ্চারিত হতে লাগলো। কৃষক এবং মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় বুরবোঁ শাসনকে সন্দেহের চোখে দেখতে লাগলো। বিপ্লবের সুফলগুলি বুঁরবোঁ রাজাদের নীতি আচরণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে, এই ভয় তাদের মনে দেখা দিলো। নেপোলিয়ন এ সংবাদ পেলেন। এদিকে অষ্টাদশ লুই নেপোলিয়নকে প্রতিশ্রুত পেনসন পাঠালেন না। এলবা দ্বীপে তাঁর নিরাপত্তার জন্যে যে সব সৈন্য রাখা হয়েছিলো, তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করে এক হাজার পঞ্চাশ জন হলো। এই সৈন্যবাহিনী নিয়ে নেপোলিয়ন ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের ১লা মার্চ ফ্রান্সে এসে উপস্থিত হলেন।

কিন্তু জার্মান যুদ্ধে হেরে তাঁর সিংহাসন গেল: তৃতীয় নেপোলিয়ন প্রাশিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বের পক্ষপাতী ছিলেন। ইতালীয় ঐক্যের সহায়তা করতে গিয়ে নেপোলিয়ন অষ্ট্রিয়ার প্রতি শত্রু ভাবাপন্ন হয়ে উঠেছিলেন। তাছাড়া অষ্ট্রিয়ার সামরিক শক্তির প্রতি তাঁর ভয়ও ছিলো যথেষ্ট। তাই তিনি শুধু প্রাশিয়ার বন্ধুত্বই কামনা করতেন না। তিনি চাইতেন, প্রাশিয়া উত্তর জার্মানীর ওপরে প্রাধান্য বিস্তার করে অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে শক্তি সঞ্চয় করুন। কিন্তু তিনি প্রাশিয়ার প্রধানমন্ত্রী বিসমার্কের প্রকৃত উদ্দেশ্য বুঝতে পারেন নি। তাই প্রাশিয়া এবং অষ্ট্রিয়ার যুদ্ধ বাধলে তিনি নিরপেক্ষ রইলেন। তিনি ভেবেছিলেন যে, ওই দুই পক্ষ ক্লান্ত হয়ে পড়লে তিনি মধ্যস্থতা করবেন। কিন্তু স্যাডোয়ার (Sadowa) যুদ্ধে অষ্ট্রিয়ার সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটলে তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পারলেন। প্রাশিয়ার অধীনে উত্তর-জার্মানী ঐক্যবদ্ধ হলে ফ্রান্সের নিরাপত্তা নষ্ট

হবে, তিনি তা বুঝলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি ইউরোপীয় শক্তি সমূহের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে তৎপর হলেন না। ফলে, ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে প্রাশিয়া দক্ষিণ জার্মানীর দেশগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করবার উদ্দেশ্যে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলো। নির্বান্ধব তৃতীয় নেপোলিয়ন সেডানের (Sedan) যুদ্ধে পরাজিত হলেন। তৃতীয় নেপোলিয়নের সিংহাসন চ্যুতির পর ফ্রান্সে তৃতীয়বার প্রজাতন্ত্র স্থাপিত হলো। বিবেকানন্দ-উক্ত জার্মান যুদ্ধ সাধারণতঃ Franco Prussian War নামে খ্যাত।

জম্বুদ্বীপের মাঝখান হতে সেলমুল তাতার নামক অসুর জাতি মুসলমান ধর্ম-গ্রহণ করে আসিয়ামাইনর প্রভৃতি স্থান দখল করে ফেললে: সেলমুল তাতার সম্ভবতঃ মুদ্রণ ঘটিত প্রমাদ। সেলজুক্ (Seljuk) নামক তুর্কী জাতি (১০৩৭—১৩০০ খ্রীষ্টাব্দ) আফগানিস্থান থেকে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ভূভাগ শাসন করতো।

কুতুবউদ্দিন হতে মোগল বাদ্‌সাই পর্যন্ত, ও সব তাতার যে জাত ভিন্নতি, সেই জাত: একমাত্র 'লোদি' রাজবংশই (১৪৫১—১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দ) এর ব্যতিক্রম। তাঁরা ছিলেন জাতিতে আফগান।

ইংরেজ রাজা রিচার্ড মুসলমান মাংসে বিশেষ খুশী ছিলেন, প্রসিদ্ধি আছে: রিচার্ড ১১৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১১৯৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডে রাজত্ব করেন। তিনি মুসলমানদের বিরুদ্ধে তৃতীয় ধর্ম যুদ্ধে যোগদান করেন (১১৮১ খ্রীঃ—৯২ খ্রীঃ) কিন্তু বিশেষ সফল হতে পারেন নি।

ইউরোপে প্রথম ইউনিভার্সিটি হলো: খৃষ্টীয় দশম শতাব্দীতে স্পেন রাজ্যে সুলতান দ্বিতীয় হাকিম কর্ডোভা-তে (Cordova) প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। তখনকার দিনে এই বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্ববিখ্যাত ছিলো।

যখন Constantine এর তলওয়ার একে রাজ্যমধ্যে স্থান

দিলে : রোমান সম্রাট কন্‌স্টান্টাইন অত্যন্ত আশ্চর্য ভাবে একটি যুদ্ধে জয়লাভ কররার পরে (৩১৩ খ্রীষ্টাব্দ) খ্রীষ্টধর্মকে তাঁর রাজ্যে স্বীকৃতি দেন। কিন্তু প্রাচীন রোমানদের বহু দেবদেবী পূজোর ধারা (Paganism) এর পরেও অনেক দিন ধরে চলেছিলো। যারা এই প্রাচীন পদ্ধতিতে পূজাআর্চা করতো, খ্রীষ্টানরা তাদের ওপরে নিষ্ঠুর অত্যাচার চালাতো। এমন কি তাদের স্ত্রীলোকদের পর্যন্ত অপমান করতে ছাড়তো না।

যে ইউরোপী পণ্ডিত প্রথম প্রমাণ করেন যে, পৃথিবী সচলা : পোলিস বৈজ্ঞানিক কোপার্নিকাস (১৪৭৩ খ্রীষ্টাব্দ—১৫৪৩ খ্রীষ্টাব্দ)। প্রচলিত মতের বিরুদ্ধে ইনি তাঁর প্রমাণ উপস্থিত করেন। এই অপরাধে ইনি ধর্মযাজক হওয়া সত্ত্বেও, চার্চ এঁকে শাস্তি দিয়েছিলো।

আমাদের ঠাকুর দেবতা সব দেখ না, জগন্নাথেই মালুম !! : এখানে বিবেকানন্দ এদেশীয় ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প সম্পর্কে বিদ্রূপ করেছেন। সম্ভবতঃ এ মন্তব্য পরিহাস মূলক। কারণ তিনি ভারতীয় ভাস্কর্য ও চিত্রশিল্প সম্পর্কে যথেষ্ট শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। এই মন্তব্যকে আকর্ষণমূলক বিদ্রূপ সমালোচনা বলা যেতে পারে। বঙ্কিমচন্দ্রের এ জাতীয় প্রচুর জাতি বিরোধী মন্তব্য তাঁর জাতিপ্রেম সম্পর্কে সন্দেহ জাগায় না।

—: :—